পিশাচের
রাত
অনীশ দেব

পিচাশের রাত উপন্যাসটি শুকতারা পত্রিকার ১৪০৮ সালের শারদীয় কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। উপন্যাসটি অনলাইনে সচরাচর পাওয়া গেলেও মান এত খারাপ যে পড়া যায় না। তাই OCR করে পিডিএফ তৈরি করা হল।

এক

শীত চলে যাচ্ছিল। তাই বসন্ত এসে হাজির হয়েছিল দরজায়।

কিন্তু প্রকৃতির কী খেয়াল, শীত আবার ঘুরে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে নিয়ে এল বর্ষা। ফলে বসন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। গতকাল সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফিকে হয়ে আসা শীত একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। রাতে শোওয়ার সময় আপনমনে গজগজ করতে করতে চিকুর মা আলমারি খুলে আবার লেপ কম্বল বের করে ফেলেছে।

'এভাবে শীত চলে গিয়ে আবার ফিরে আসার কোনও মানে হয়!

চিকুর বাবা একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজটা খুটিয়ে পড়ছিল, চিকুর মায়ের কথায় হেসে ফেলল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুব বিচ্ছিরি। ওই যে সেলি আমি অফিসে বেরিয়ে গেলাম। তারপর চশমাটা ভুলে ফেলে গেছি বলে ফিরে এলাম—তাতে চিকুর খুব অসুবিধে হয়ে গিয়েছিল...।'

চিকু ওয়াকম্যানের হেডফোন কানে লাগিয়ে সবে হিন্দি গান শোনার তোড়জোড় করছিল, বাবার কথায় অনুযোগ করে উঠল, কী হচ্ছে, বাবা?"

বাপারটা গত সপ্তাহের। বাবা সকাল দশটা নাগাদ অফিসে রওনা হতেই ও রবারের বল নিয়ে ঘরের মধ্যে ফুটবল খেলতে শুরু করেছিল। আর মিনিট। পাঁচেকের মধ্যেই বাবা আচমকা ফিরে আসায় কী কেলেঙ্কারি। কারণ, সামানা জ্বর মতন হয়েছে বলে সেদিন ও স্কুলে যাবে না ঠিক করেছিল। বাবা ওর কথায় সায় দেওয়ায় মা শত জেদ করেও ওকে স্কুলে পাঠাতে পারেনি। এখন মায়ের চেঁচামেচি গ্রাহ্য না করে ও ফুটবল প্র্যাকটিস করছিল। সামনের রবিবার জামতলার তরুণ সঙ্ঘের সঙ্গে ম্যাচ। ম্যাচত নয়—একেবারে প্রেস্টিজ।

ফাইট। তাই....।

বাবা কোনও সময় চিকুকে ককবকি করে না। চশমা নিতে এসে ওকে খেলতে দেখে শুধু বলেছিল, বল খেললেই দেখবি তোর জ্বর সেরে যাবে।

তারপর হেসে চলে গিয়েছিল।

চিকু তাতে ভীষণ লজ্জা পেয়ে সেদিন এমন পড়াশোনা করেছিল যেন

ওর মাধ্যমিক পরীক্ষা একেবারে কাছে এসে গেছে। অথচ ও এখন সবে ক্লাস নাইনে পড়ে।

আজ সকালের খবরে চিকু শুনেছে। উষ্ণতা এক ধাক্কায় চার ডিগ্রি কমে গেছে। সুতরাং ওর হাতকাটা সোয়েটার আর মাফলার আলমারির তাক থেকে আবার বেরিয়ে এসেছে।

সন্ধে ছ'টার সময় হরিহরবাবুর কোচিং-এ চিকু বাংলা পড়তে যায়। হরিহরবাবু চিকুদের হাইস্কুলের বাংলা স্যার ছিলেন। বছর দুয়েক হলো রিটায়ার করেছেন। বাংলা দারুণ পড়ান—তাই ওর কোচিং-এ খুব ভিড়। তাছাড়া ভীষণ পণ্ডিত মানুষ—নানান বিষয়ে অনেক জানে।

চিকু যখন সাইকেল নিয়ে বেরোল তখন বৃষ্টি পড়ছে কি পড়ছে না। তবে আকাশের এখানে-ওখানে বেশ মেঘ জমে রয়েছে।

মা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কেবল টিভিতে সিনেমা দেখছিল। চিকুকে বেরোতে দেখে বলল, 'অ্যাই, ছাতা নিয়ে বেরোবি'।

চিকু আবদারের গলায় বলল, বৃষ্টি তো পড়ছে না!'

একটু পরেই পড়বে।

বিরক্তভাবে মায়ের ফোল্ডিং ছাতাটা ব্যাগে ভরে নিল চিকু। তারপর সিঁড়ির নিচ থেকে সাইকেলটা বের করে রাস্তায় চলে এল।

হরিহরবাবুর কোচিং সাইকেলে বড়জোর পাঁচ মিনিট। ঘণ্টি বাজিয়ে জোরে প্যাডেল করতে শুরু করল চিকু। বৃষ্টি জোরে নামার আগেই

ওকে কোচিংএ পৌছতে হবে। ছাতা মাথায় দিয়ে সাইকেল চালানো এক ঝকমতি।

সরু পিচের রাস্তা ভাঙাচোরা গত কয়েক বছর ধরেই। এই দু দিনের বৃষ্টি সব বেহাল করে দিয়েছে। রাস্তায় লোকজন কম। যেকজন চোখে পড়ল সকলেই সোয়েটার, মাফলার কিংবা চাদরমুড়ি। নাটোর মোড়ের কাছে শ্যামা তেলেভাজার দোকান পেরিয়ে গেল চিকু। সেখানে বেশ ভিড়। সাইত, রিকশাগুলো প্যাকপ্যাক হর্ণ বাজিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে।

ডানদিকে ঘুরে শিবতলার হর-পার্বতীর মন্দির পেরোতেই চিক দেখল দেশপ্রিয় সুইটস-এর পাশে বেঞ্চিতে রোহনদারা বসে আছে।

এ-এলাকা রোহনদের কথা মত চলে। কোথাও কোনও গোলমাল হলে রোহনরা সবার আগে সেখানে ছুটে যায়। রাতবিরেতে বিপদ-আপদ হলে রোহন এক ডাকে হাজির। গত পুজোর সময় সমীর মিত্রদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। ওদের কাজের লোক কোনওরকমে পালিয়ে এসে রোহনের বাড়িতে খবর দিয়েছিল। রোহন সঙ্গে সঙ্গে দলবল জুটিয়ে মিত্রদের বাড়িতে গিয়ে হাজির। গুলি-বোমা নিয়ে হাড্ডাহাডিড লড়াইয়ের পর দুজন ধরা পড়েছিল, আর তিনজন পালিয়ে গিয়েছিল। কষে গণধোলাই দেওয়া আধমরা ডাকাত দুটোকে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

চিকুকে দেখে রোহন হাত নেড়ে, চেঁচিয়ে বলল, কোচিং যাচ্ছিস?”

সাইকেল না থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে চিকু জবাব দিল, “হ্যা—বাংলা।'

রোহন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার একবার ফেল করার পর আর লেখাপড়া করেনি। ওর বাবার সিমেন্ট-বালির

দোকান আছে সেখানে মাঝে-মাঝে বসে। চিকুর সঙ্গে যখনই কথা হয়

তখনই লেখাপড়া করতে পারেনি দুঃখ করে। চিকুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'তুই লেখাপড়ায় ফার্স্ট।

চালিয়ে যা।।

জলাপুকুরের পাড় দিয়ে সাইকেল এগিয়ে যেতে যেতে চিকুর এসব কথা মনে পড়ছিল। পুকুরের অন্ধকার জলে রাস্তার দু-চারটে মিটিমে বালবের ছায়া পড়ছে। গ্যাঙর গ্যাঙ ব্যাঙের দল ট্রপেডের মিটিং শুরু করে দিয়েছে।

কোথায় যেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল ওরা। বৃষ্টি হতেনা-হতেই লুকনো আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে শোরগোল শুরু করে দিয়েছে!

জলপুকুরের নামটা কেন যে এরকম অদ্ভুদ কেউ জানে না। মাপে প্রকাণ্ড হলে কি হবে শ্যাওলা আর কচুরিপানায় প্রায় পুরোটাই ঢাকা। পুকুরের দু-কোণে ইট পাথর পেতে সবাই ঘাটের মতো করে নিয়েছে। সেখানেই বাসন মাজা আর তাদের কাজ চলে।

জায়গাটা বেশ নির্জন, আর শীতও যেন বেশি। চিকুর হয়তো ভয়-ভয় করছিল কিন্তু ব্যাঙের দল ওকে সাহস দিল। ও তাড়াতাড়ি প্যাডেল ঘোরাতে শুরু করল।

জলপুকুর পেরিয়েই বিশাল এক ফলবাগন। চিকু শুনেছে, এককালে মানে শুধুই আমগাছ ছিল। কিন্তু এখন তারই মাঝে কাঠাল, শিমূল, তেঁতুল গাছ গজিয়ে জায়গাটা ঝুপসি হয়ে গেছে। তবে জায়গাটার নাম এখনও সেই আমবাগান।

গাছ-গাছরার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা জন্য পথ। এখন বৃষ্টিতে কাদা কাদা হয়ে গেছে। চিকু সাবধানে সাইকেল চালাতে লাগল। সাইকেলের হেডলাইট ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

আমবগান পেরিয়ে রাজবাড়ি। তবে এখন যা অবস্থা তাতে রাজবাড়ি বলতেও কোনও অসুবিধে নয়। ভাঙাচোরা দোতলা বাড়িটা প্রকাণ্ড বসা কচ্ছপের মতো মাঠের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রাজার দুই নাতি না পুতি তাদের পরিবার নিয়ে একতলার পাশের ঘরে এখন বাস করে। সেদিকটায় দু-চারটে ঘরে রাতে আলো জ্বলে। বাগানের নানা জায়গা থেকে বট আর অশথের চারা গজিয়ে রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা তো রীতিমতো গাছের চেহারা নিয়েছে। এখন অন্ধকারে সেটা। ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না। তবে মেঘ সরে গিয়ে আকাশে একটা ছোট জানলা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর সেই জানলা দিয়ে

থালার মতো চাদটা উকি মারতেই চিকুর মনে পড়ে গেল আজ পূর্ণিমা। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় রাজবাড়ির ভাঙ্গ ছাদটা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছিল, আর সেইসঙ্গে গোটা তিন-চারেক বট কিংবা অশ্বথ গাছকে চেনা যাচ্ছিল।

রাজবাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়েই বাঁদিকে একটা সরু গলি ঢুকে গেছে। সেই গলিতেই হরিহরবাবুর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। একতলাটা থাকার মতো হলেও দোতলাটা এখনও ইট কাঠ বের করা। বোধহয় টাকার অভাবে শেষ করা যায়নি। বাড়ির লাগোয়া জমিতে দুটো সুপুরি আর একটা চাপা গাছ। সুপুরিগাছ দুটো দেখলেই চিকুর হরিহরবাবুর পান। খাওয়ার নেশার কথা মনে পড়ে যায়।

দরজার কাছে একটা বাল্ব জ্বলছিল। সেই আলোয় চিকু দেখল গ্রিলের গেটের পাশে পাঁচ-ছটা সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে নিজের সাইকেলটা রেখে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল চিকু।

কিন্তু পড়ার ঘরটায় ঢুকেই ও বেশ অবাক হয়ে গেল।

কৌশিক, প্রিয়াংকা, তিতুন, সুকান্ত আর প্রদীপ্ত গোল হয়ে বসে তেল-মুড়ি খাচ্ছে। সঙ্গে কাচা পেয়াজের টুকরো আর চানাচুর। ঘরে স্যার নেই।

চিকুরা একসঙ্গে আটজন বাংলা পড়ে। তবে আজ বোধহয় বৃষ্টি আর শীতের জন্য শ্রবণী আর উত্তম আসেনি।

চিকু ঘরে ঢুকতেই কৌশিক আর তিন সরে গিয়ে সতরঞ্জিতে ওকে বসার জায়গা করে দিল। সুকান্ত বলল, 'নে, মুড়ি-চানাচুর খা। আজ স্যারের শরীর ভালো নেই—পড়াবে না।”

প্রদীপ্ত চাপা গলায় বলল, 'কাকিমা মুড়ি মেখে খেতে দিলেন।

কাকিমা মানে হরিহরবাবুর স্ত্রী।

ওদের সবাইকে খুব ভালোবাসে। গোলগাল হাসিখুশি চেহারা। প্রায়ই ওদের নানান জিনিস খাওয়ান।

সতরঞ্জির মাঝখানটায় আবরের কাগজ পাতা—তার ওপরে মুড়ির

পাহাড়। চিকু বসেই ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল মুড়ির দিকে। পরপর দু-মুঠো মুড়ি মুখে গুজে দিয়ে জড়ানো গলায় বলল, “আমরা কি তা হলে আবার সামনের বুধবার আসব?”

প্রিয়াংকা কপাল থেকে চুল সরিয়ে বলল, কাকিমা তো তাই বললেন।

এমন সময় হরিহরবাবুর স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন।

চিকুকে দেখেই আপনজনের মতো একগাল হেসে বললেন, ‘চিকু, শুনেছ তো, আজকে পড়া হবে না। তোমাদের স্যারের শরীরটা ভালো নেই জ্বর-জ্বর। মতন হয়েছে। আগে থেকে খরবটা দিতে পারলে ভালো হতো। এই বিচ্ছিরি ওয়েদারের মধ্যে এসে শুধু-শুধু তোমাদের ফিরে যেতে হলো।

“তাতে কী হয়েছে, কাকিমা। আমরা পরের বুধবার আসব।'

নাও, মুড়ি-চানাচুর খাও। তোমরা কেউ চা খাবে?”

ওরা সবাই মাথা নাড়ল। না, খাবে না। হরিহরবাবু বলেন, 'নেশার বশ হবি না কখনও। পোয় যদি মানতে হয় তো সে শুধু ভগবান কি মহাজনের কাছে। দ্যাখ না, কত চেষ্টা করেও আমার পানের নেশাটা ছাড়তে পারছি না।'

সুতরাং, ওরা কেউ-কেউ চা খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও মুখে ‘না’ বলল।

মুড়ি-চানাচুর শেষ করে ওরা কাকিমাকে বলে বেরিয়ে পড়ল।

প্রিয়াংকা চিকুকে বলল, তোমাকে “মোহাব্বতের ক্যাসেটটা দেব বলেছিলাম, এখন আমার সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসতে পারো। আর আমাদের ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেমে একবার শুনেও নিতে পারোকী দারুণ আওয়াজ..ফ্যানট্যাসটিক।”

চলো। তবে আমাদের টেপ রেকর্ডারটা অর্ডিনারি টু-ইন-ওয়ান। ওতে একস ভালো শোনাবে না মনে।

এ-ও কে টা-টা করে ওরা সাইকেল নিয়ে যে যার পথে ছড়িয়ে গেল। শুধু প্রিয়াংকা আর চিকুর সাইকেল দুটো একই পথ ধরে

সমান্তরালভাবে এগিয়ে প্রিয়াংকাদের বাড়িটা চিকুদের বাড়ির উলটোপথে অনেকটা দূরে। ওদের বাড়ি থেকে রেল স্টেশনটা কাছে। সেখানে। কে কয়েকটা সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে। ঠিক যেন জলরঙে আঁকা ছবি। কিন্তু এর আগে দু চারার প্রিয়াংকাদের বাড়ি। গেছে। ওদের বাড়িতে গেলে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় খেয়াল থাকে না। আজ অবশ্য দেরি হওয়ার কোনও ভয় নেই, মা বাবা চিন্তাও রবে না। ওরা জানে চিকু বাংলা কোচিং-এ পড়ছে।

অন্ধকার পথ ধরে সাইকেল চালাতে চালাতে চিকু জিগ্যেস করল, এই পথ দিয়ে একা একা ফিরতে তোমার ভয় করে না?

প্রিয়াংকা শব্দ করে হাসল। ওদের সাইকেলের চাকা ঘুরতে লাগল।

দুই

বাড়ির দিকে ফেরার সময় রাজবাড়ির কাছাকাছি এসে চিকু প্রথম বিপদের গন্ধ পেল। পরিস্থিতি আর পরিবেশ কেন যেন অন্যরকম মনে হলো ওর। আর সেইজনই একটা শঙ্কা তৈরি হলো। সবই ঠিক আছে, আবার কিছুই ঠিক নেই। কিন্তু গণ্ডগোলটা যে ঠিক কোথায় সেটাই ও ধরতে পারছিল না।

যতটা জোরে পারা যায় তত জোরেই সাইকেল চালাচ্ছিল। আর একইসঙ্গে ওর মনের ভেতরে উথালপাথাল চলছিল, একটাই প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল ? গণ্ডগোলটা কোথায়?

তার হাতে ঘড়ি নেই, তবে রাত বোধহয় ন'টা সাড়ে ন'টা হবে। এতটা রাত না করলেই হতে।

বৃষ্টি এখন নেই। আকাশ কে পরিষ্কার হয়ে গেছে। পূর্ণিমার চাদ | উল চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। বাস কে ঠাণ্ডা। চিকুর মেয়েটার ভেদ করে শীত ঢুকে পড়ছে ভেহবে। আজ রাতে মনে হয় লেপ গায়ে দিতে হবে।

রাজবাড়ি পেরিয়ে আমবাগানের কাছাকাছি এসে গণ্ডগোলটা খেয়াল করল এই পথে যাওয়ার সময় পথের আশপাশ থেকে দু-পাঁচটা ব্যাঙের ডাক ওর কানে এসেছিল। হয়তো রাস্তার। পারে নালায় বা জমে থাকা জলে কয়েকটা ব্যাঙ আস্তানা গেড়েছিল।

কিন্তু এখন ওরা আর কেউ ডাকছে না। কেউ যেন ভয় দেখিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

ঠিক তখনই ও খেয়াল করল জুলাপুকুরের দিক থেকেও ব্যাঙের কোরাস আর শোনা যাচ্ছে না। চারপাশটা কেমন যেন থমথম করছে। শুধু গাছের পাতার খসখস শব্দ।

জোরে প্যাডেল করে আমবাগানটা পেরিয়ে যেতে চাইল চিকু। ওর কেন কেন ভয়-ভয় করতে লাগল।

আমবাগান শেষ হওয়ার মুখে একটা চাপা গর্জন ওর কানে এল। প্রচণ্ড রাগে কোনও পশু গরগর করছে। তার চাপা গোঙানির মধ্যেই

হিংস্র ভাব টের পাওয়া একইসঙ্গে জান্তব একটা গন্ধও নাকে

আতঙ্কে বেপরোয়া গতিতে সাইকেল ছোটাল কি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। একটা পাথর বা ইটের টুকরোয় হোঁচট খেয়ে ওর সাইকেল শূন্যে লাট খেয়ে পথের ওপরে ছিটকে পড়ল।

চিকু একদিকে, ওর ব্যাগ একদিকে, আর সাইকেল আর-একদিকে। সাইকেলের একটা চাকা তখনও ঘুরছে। হেডলাইটটা কাত হয়ে তেরছাভাবে আলোর কণা ছুড়ে দিয়েছে। আলো কমেই নিভে আসছে।

চিকুর সারা শরীরে কাদা মাখামাখি।

কনুইয়ে একটু চোটও লেগেছে। কিন্তু ভয় বড় আশ্চর্য জিনিস। পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করিয়ে নেয়। ফলে তখন ভয় আর ভগবানে কোনও তফাৎ থাকে না।

চিকু চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে পড়ল। দু-পা ফেলে এগিয়ে ব্যাগের কাছে। ব্যাগটা এক ঝঁটকায় তুলে নিয়ে সাইকেলের দিকে এগোতেই জিনিসটা ওর চোখে পড়ল ।

সাইকেলের আলো ততক্ষণে ক্ষয়ে এসেছে। কিন্তু পূর্ণিমার আলোয় ক্ষয় ধরেনি। তাই চিকুর দেখতে খুব সে অসুবিধে হলো না।

পায়ে-পায়ে জিনিসটার কাছে এগিয়ে গেল। সেটা চিনতে পারামাত্র একটা আতঙ্কের চিৎকার ওর গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে গেল। কিছুই গলা দিয়ে বেরোতে পারছিল না।।

একটা মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে রয়েছে বৃষ্টিভেজা মাটিতে। মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। হাত পাগুলো এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক ছড়ানো। চাদের আলোয় রক্তের বং বোঝা যাচ্ছিল না। ফলে মনে হচ্ছিল বৃষ্টির জমে থাকা কালো জলের উপর ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানুষটা পড়ে আছে। চিকুর মাথা কাজ করছিল না। আর

অন্ধ ভয় ওকে দিয়ে যান্ত্রিকভাবে কাজ করিয়ে নিচ্ছিল। ও ছুটে গিয়ে সাইকেলটা তুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে এল ভয়ঙ্কর এক গর্জন। এবার

গর্জন এসেছে জলাপুকুরের দিক থেকে।

এটা কি বাঘের গর্জন? কোথাও থেকে একটা বাঘ কি এসে ঢুকে পড়েছে আমবাগানে?

প্রাণপনে সাইকেল চালাতে শুরু করল চিকু। আর তখনই শুনতে পেল জলাপুকুরে কেউ কেন ঝপাং করে ঝাপিয়ে পড়ল।

এই শীতের রাতে বাঘ হঠাৎ জলে ঝাপ দেবে কেন?

এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে যেতে যেতে জলাপকুলের দিকে অকাল ও। জলে কিএক একটা নড়ছে যেন! কেউ যেন সবল উল্লাসে জল ঘেটে দাপাদাপি করে স্নান করছে।

কৌতুহল বড় আশ্চর্য জিনিস। কখনও কখনও ভয়কেও ছাপিয়ে যায়। চিকুর বেলায়ও তাই হলো। জলাপুকুরের ধারে সাইকেল দাঁড় করিয়ে দিল ও। তবে প্যাডেলে পা চেপে তৈরি থাকল। ওর হাত-পা ধর করে কাপছিল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জলের শব্দ থামল। কিছু একটা উঠে আসতে দেখল জল থেকে।

প্রাণীটাকে জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা গোল। তবে ওটার মাথায় কচুরিপানা আর শ্যাওলা বোঝাই হয়ে থাকায় মুখটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। লোমশ হাত দিয়ে সেগুলো সরাতে চেষ্টা করছিল। হাতটা বনুষের মতো হলেও আঙুলের ডগায় লম্বা সাদা বাঁকানো নখ। সামনে ঝুকে পড়ে কুঁজো হয়ে প্রাণীটা জল থেকে উঠে আসছিল। হাঁটু দুটো সামান্য ভাজ করে জলের মধ্যে পা ফেলছে। যেন কোনও চারপেয়ে জন্তু দু-পায়ে হাঁটার চষ্টা করছে।

একটা হিংস্র গর্জন বেরিয়ে এল প্রাণীটার মুখ থেকে।

চিকুর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অতক্ষণ দল পাকিয়ে আটকে থাকা চিৎকারটা ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

একটানা চিৎকার করতে করতে পাগলের মতো সাইকেল ছুটিয়ে দিল

চিকু।

ও যখন বাড়ি এসে পৌঁছল তখনও ওর চিৎকার থামেনি।

মা-বাবা ছুটে বেরিয়ে এল দরজায়। দেখল চিকুর জামাকাপড় রক্ত আর কাদায় মাখামাখি।

ছুটে গিয়ে ওকে জাপটে ধরে। "আকুলভাবে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে রে, কী হয়েছে?'

চিৎকার করতে করতেই চিকু আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

তিন

পরদিন সকালে বেলা দশটার মধ্যেই পাশবিক খুনের এই ঘটনাটা জাঙ্গিকুলের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেল।

খুব ভোরে কেউ একজন পথের ওপরে পড়ে থাকা বীভৎস মৃতদেহটা আবিষ্কার করে। তারপর সেই ভয়ঙ্কর খবরটা ছোট এলাকায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

বেশ কয়েক বছর ধরে এই আধা-টাউনে খুনের মতো কোনও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেনি। তাই এই খুনটাকে কেন্দ্র করে গোটা অঞ্চল একেবারে তেতে উঠল। পুলিশও তাদের নিয়মমাফিক তদন্ত শুরু করে দিল।

যে-লোকটি খুন হয়েছে সে একজন ভবঘুরে ভিখারি। তাকে খুন করার কোনও উদ্দেশ্য খুজে বের করাটাই বেশ মুশকিলের। তা ছাড়া খুনটা কোনও মানুষের কাজ নাকি কোনও হিংস্র জন্তুর সেটা নিয়েও চায়ের দোকানে, সেলুনে, বাজারে কেশ তর্ক বেধে গেল। কেউ কেউ খোজ করতে লাগলেন এ-এলাকার দু-চার মাইলের মধ্যে কোনও সার্কাস পার্টি এসে ঘাঁটি গেড়েছে কি না। আর তাদের দলে বাঘ কিংব সিংহের মতো হিং জন্তু-জানোয়ার আছে কি না।

তবে বেশিরভাগ মানুষেরই মত হলো, মৃতদেহটার যে ছিন্নভিন্ন বীভৎস অবস্থা দেখা গেছে তাতে এ কাজ কোনও মানুষের হতে পারে না।

তা হলে এর পরের প্রশ্ন হলো, যদি এটা হিংস্র কোনও পশুর কাজ হয় তো সেই পশুটা কী? বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, হায়েনা নাকি অন্য কিছু।

পরদিন চিকু বাড়ি থেকে আর বেরোয়নি। মা-বাবা দুজনেই ওকে স্কুলে যেতে দেয়নি।

কাল রাত থেকে চিকুর বাড়াবাড়ি রকম অবস্থা চলছে। বারবার ও কেঁপে উঠেছে ভয়ে। মা ওর পাশাটিতে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর ঘুম আসেনি। কখনও কখনও তন্দ্রায়

ওর চোখ বুজে এসেছে। আবার তারই মধ্যে গোঙানির শব্দ করে চমকে জেগে উঠেছে। তখন মা আধখানা ঘুমের ট্যাবলেট চিকুকে খাইয়ে দিয়েছে।

বাবা ডাক্তার ডাকার কথা বলেছিল, কিন্তু মা রাজি হয়নি। বলেছে, ওর তো জ্বর-টর কিছু হয়নি! মনে হয় ভীষণ ভয় পেয়েছে। আজ রাতটা বিশ্রাম নিক কাল সকালে যা হয় করা যাবে।

চিকুর শেষ পর্যন্ত ঘুম এসেছিল অনেক রাতে। ফলে ওর ঘুম ভেঙেছে বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ। তারপর থেকে শুধুই বিশ্রাম, আর জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশ, গাছপালা, আর রাস্তা দেখা।

আজও বেশ শীত। তবে বৃষ্টি থেমে গেছে।

একা-একা বিছানার লাগোয়া জানলার পাশে বসে চিকু ভাবছিল, কাল রাতে ও যা দেখেছে তা সত্যি কি না। এখনও পর্যন্ত মা-বাবাকে ও কোনও কথা বলেনি। বললে ওরা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, ব্যাপারটা একটু বাজে দুঃস্বপ্ন নয় তো!

চিকুর শরীরটা ভালো নয় দেখে ওর বাবা আজ অফিসে বেরোয়নি। তাই হাতে সময় পেয়ে বাজার-দোকান সেরে নিচ্ছিল। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাজার থেকে ফিরে বাবা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। মায়ের সঙ্গে চাপা গলায় কীসব কথা বলতে লাগল।

চিকু বুঝতে পারল, ওকে আড়াল করে বাবা-মা কোনও আলোচনা করছে।

ওর হঠাৎ করেই মনে হলো, আলোচনার বিষয়টা ওর বোধহয় জানা।

একটু পরে মা চিকুকে স্নানের গরম জল দিল। স্নান হয়ে যাওয়ার পর তোয়ালে নিয়ে যত্ন করে মাথা মুছিয়ে দিল। তারপর খেতে দিল।

মায়ের ভাবভঙ্গিগুলো এমন যেন চিকু এখনও সেই পাঁচ বছরের ছোট খোকাটিই আছে।

খেয়েদেয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেই ঘুম এসে ওর দুচোখ জড়িয়ে ধরল। চিকু ঘুমের জগতে ডুবে গেল একেবারে।

ঘুম ভাঙল সেই চারটের পর। মেঘ ফিকে হয়ে আকাশটা এখন বেশ আলোআলো লাগছে। তবে রাস্তা এখনও ভিজে। দুপুরে বোধহয় আর -এক দফা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে।

মা চা তৈরি করে বাবাকে দিল, নিজে নিল তারপর চিকুকেও একটু সাধল। দুটো বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দে, শরীরটা বেশ তাজা লাগবে।”

বাবা আড়চোখে কেমন যেন খুটিয়ে দেখা চোখে চিকুকে দেখছিল। চিকু চুপচাপ বসে চা-বিস্কুট খেতে লাগল।

চিকুর চা খাওয়া শেষ হতে নাহতেই টেলিফোন বেজে উঠল। বাবা তাড়াতাড়ি এসে রিসিভার তুলল। তারপর হ্যালো' বলেই রিসিভারটা এগিয়ে ধরল চিকুর দিকে। তোর ফোন। কথা বলতে পারবি?

চিকু ঘাড় নেড়ে নেমে এল বিছানা থকে। বাবার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে হ্যালো বলল।

প্রিয়াংকাঃ আজ স্কুলে যাওনি? আমরা স্কুলে যাওয়ার সময় জনতা কেবিনের সামনে তোমাদের দেখলাম না, তাই ভাবলাম হয়তো শরীরটরির খারাপ হয়েছে।

রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় চিকু একটা বাকের মুখে ওর আরও দু-বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করে। সেখানে 'জনত কেনি' নামে একটা ভাতের হোটেল আছে। হোটেলের সামনে তিনজন জড়ো হওয়ার পর ওরা দল বেঁধে স্কুলে যায়। মোটামুটি সেই সময়টায় প্রিয়াংকাও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একজোট হয়ে স্কুলের পথে হেটে যায়। বেশিরভাগ দিনই ওদের দেখা হয়।

চিকু কলল, 'না, আজ স্কুলে যাইনি, শরীরটা ভালো নেই...ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।

মোহাব্বতে"-র ক্যাসেটটা শুনেছ?'

না, এখনও শোনা হয়নি। আজ সন্ধ্যেবেলা শুনব।

কাল তোমার ফেরার সময় কোনও প্রবলেম হয়নি তো?”

একটু ভেবে নিয়ে চিক ছোট কবে বলল, না....।

আসলে কাল জলা পুকুরের কাছে একটা মার্ডার হয়েছে। ব্রুটাল মার্ডার। সবাই বলছে কোনও ডেঞ্জারাস অ্যানিম্যালের কাজ। সেইজন্যেই চিন্তা হচ্ছিল। ভাবছিলাম তুমি কাল ঠিকমতে বাড়ি ফিরেছ কি না। আমি স্কুল থেকে বাড়িতে এসেই তোমাকে ফোন করছি।'

চিকু সারাদিনে বাবা কিংবা মায়ের মুখে খুনের কোনও খবর শোনেনি। যদিও ও জানে, এই ছোট আধা-টাউন এলাকায় খবরটা এর মধ্যে সবাই জেনে গেছে। বাবা-মা হয়তো চিকুর ডালোর জন্যই খবরটা ওকে জানায়নি। ওরা তে আর জানে না, চিকুর খবর জানার কোনও প্রয়োজন নেই কারণ, 'খবরটা ও কাল রাতে নিজের চোখে দেখেছে।

কাল রাতের দৃশ্যটা মনে পড়তেই চিকু একবার শিউরে উঠল। এখনও পর্যন্ত মা-বাবা কাউকে ও কিছু বলেনি। কাল মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মা বার জিগ্যেস করেছে, কী রে, ভয় পেয়েছিস? কি হয়েছে বল? আমাকে বল --

কিন্তু চিকু কোনও কথা বলে না। মনটা কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য এখন অনেক ভালো লাগছে। মন আর শরীবের দুর্বল ভাবটা কেটে গেছে। কিন্তু কাল রাতে খুন হওয়া মানুষটা কে?

সে কথাই ও প্রিয়াংকাকে জিগে করল, কাল রাতে কে মার্ডার হয়েছে জানো?'

‘সবাই বলছে একজন ভ্যাগাবন্ড ভিখারিগোছের লোক।'

'নেক্সট উইকে বাংলা পড়তে যাচ্ছ তো?

হ্যা - যাব।

প্রিয়াংকার সঙ্গে একমাত্র বাংলা কোচিংটাই ওর কমন। অন্যান্য সাবজেক্টের টিচাররা প্রিয়াংকাকে বাড়ির এসে পড়ান। হরিহরবাবু কারও বাড়ি গিয়ে পড়ান না—তাই প্রিয়াংকা ও কোচিং-এ এসে পড়ে।

কথা শেষ করে চিকু রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মুখ ফেরাতেই চিকু খেয়াল করল আর বাবা কেমন অদ্ভুত চোখে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

বাবা অবাক হয়ে বলল, তুই মার্ডারের ব্যাপারটা জানিস ! খবর পেলে কী করে?

চিকু আঙুলের নখ খুটল কিছুক্ষণ এরপর মাথা নিচু করে বলল, 'আমি সব জানি। সব আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেইজনেই কাল রাতে এ ভয় পেয়েছিলাম।'

ঘরে যেন বাজ পড়ল। | মা প্রায় ছুটে এল চিকুর কাছে। কী দেখেছিস কাল রাতে।

একটু সময় নিল চিক। তবে নিচু গলায় ধীরে ধীরে সব ঘটনা বলে "

মা আর বাবা ফ্যাকাসে মুখে শুনতে লাগল।

চিকুর কথা শেষ হলে মা-বাবা দুজনেই ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এক অনেক প্রশ্ন করল।

চিকুও সেগুলোর উত্তর দিতে চেস্টা করল। তারপর ওরা দুজনে কেমন গুম হয়ে গেল। স্থির চোখে চিকুকে দেখতে লাগল।

ওরা মনে-মনে কী ভাবছে সেটা চিকু খানিকটা আঁচ করতে পারছিল। তবে বাবা এরপর একটা প্রশ্ন করতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল।

তুই--তুই ভুল দেখিসনি তো?”

চির একটু বিরক্ত গলায় বলল, না, ভুল দেখিনি। বানিয়ে নিয়ে এরকম গল্প তৈরি করে আমার কী লাভ?

একটা চিন্তা করে বাবা বলল, থাক এসব কথা আর কাউকে বলিস না। শেষকালে পাঁচকান হতে-হতে পুলিশের কানে গেলেই মুশকিল।

মা চিন্তার গলায় বলল, হ্যা, তখন আবার টানাহ্যাচড়া শুরু হবে, হাজারটা প্রশ্ন করবে। না, না, এসব কথা তুই কাউকে বলিস না।

. “ঠিক আছে, বলব না।”

চিকু কথাটা বলল বটে, তবে ওর সবাইকে বলতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছে ছিল জলাপুকুরের কাছে গিয়ে দিনের ছালোয় খুনের জায়গাটা একবারে দেখে আসতে। ওখানে গেলে কি প্রাণীটার পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে? অথবা গায়ের লোম?

চিকুর মধ্যে একটা গোয়েন্দা জেগে উঠতে চাইছিল।

ও আর কোনও কথা না বলে পড়ার টেবিলে গিয়ে পড়তে বসল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পড়ায় মন বসাতে পারল না। বারবার কাল রাতের ঘটনাগুলো ওর মাথায় ঢুকে পড়েছিল। হঠাই ওর চোখ গেল টেবিলের এক প্রান্তে পড়ে থাকা মোহব্বতে-র ক্যাসেটটার দিকে। কী ভেবে চিকু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের পাশ থেকে ওয়াকম্যানটা তুলে নিয়ে এল।

তারপর হেডফোনটা কানে লাগিয়ে মোহব্বতে'র ক্যাসেটটা শুনতে শুরু করল।

জানালার বাইরে তখন অন্ধকার পা টিপেটিপে নেমে আসছে।

চার

শেষ পর্যন্ত চিকুর ব্যাপারটা আর পুরোপুরি গোপন রইল না।

এরকম একটা মারাত্মক ব্যাপার ও নিজের চোখে দেখেছে, এটা কাউকে না বলতে পারলে ও কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছিল না। সবাই একথা জানতে পারলে চিকুকে ঘিরে কত হইচই হতো, ওর সাহসকে কত লোক প্রশংসা করত, একই গল্প ওকে কতবার না শোনাতে হত!

ভেতরের এই সাংঘাতিক টেনশন চিকু অতিকষ্টে তিনদিন সামলে রাখতে পারল। তারপর একদিন খবরটা ও ভাঙল প্রিয়াংকার কাছে। সেদিন ও মোহাব্বতের ক্যাসেটটা ফেরত দিতে প্রিয়াকোদের বাড়িতে গিয়েছিল। খবরটা শুনে প্রিয়াংকা তো একেবারে বোবা হয়ে গেল। ও অবাক হয়ে চিকুকে দেখতে লাগল।

‘মাই গুডনেস! কী ডেঞ্জারাস! এতবড় একটা ব্যাপার তুমি আমাকে বলনি!

কাউকে এসব কথা বলো না। মা-বাবা কাউকে বলতে বারণ করেছে।

প্রিয়াংকা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল চিকুকে। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চিক মনে-মনে পূর্ণিমার সেই ভয়ঙ্কর রাতটায় ফিরে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যে সাতটা বাজতে না বাজতেই প্রিয়াংকা একরকম জোর করে চিকুকে বাড়ি রওনা করে দিলো।

প্রিয়াংকার পর স্কুলের বন্ধু সোহনের কাছে গোপনে মুখ খুলল চিকু। স্কুল থেকে ফেরার পথে সোহনকে জলাপুকুরের গল্পটা শোনাল ও।

এরপর কানাকানি আর জানাজানির ব্যাপারটা নিউক্লিয় শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মতো ক্রমে বাড়তে শুরু করল। দশবারোদিনের মধ্যেই জাঙ্গিকুলের প্রায় সকলেই জেনে গেল পূর্ণিমার রাতে জলাপুকুরের কাছে চিকু কি দেখেছে।

একদিন সন্ধ্যেকালে দেশপ্রিয় সুইটস থেকে মিষ্টি কিনে ফিরছিল চিকু। হঠাই শুনতে পেল কে যেন ওকে নাম ধরে ডাকছে।

সাইকেল থামিয়ে ঘড় ঘোরাতেই চিকু রোহনদাকে দেখতে পেল। বিশুদার চায়ের দোকানে বসে আছে।

শিবতলার উলটোদিকেই বিশুদার চায়ের দোকান। রাস্তার একপাশে বাঁশের খুঁটি আর দরমা দিয়ে তৈরি। দোকানের মাথায় টালির ছাউনি।

বিশুদা একা মানুষ। দোকানের পিছনদিকটায় থাকার মতো একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে। আর দোকানের সামনে আধ-ফালা বাঁশ পেরেক দিয়ে ঠুকে খদ্দেরদের বসার জন্য একটা বেঞ্চি মতন তৈরি করে দিয়েছে।

বিশুদার দোকানটা নামে চায়ের। দোকান হলেও ডিম-পাউরুটি, বিস্কুট, সিগারেট, হজমিগুলি, পান-পরাগের প্যাকেট আর বাচ্চাদের খেলার প্লাস্টিকের বলও পাওয়া যায়।

দোকানের সামনের বেঞ্চিতে রোহন আর ছোটকু বসে ছিল। ছোটকু রোহনের সব-সময়ের সাথী। কালো, রোগাপটকা চেহারা, চোখগুলো বড় বড়, মাথায় কোকড়ানো চুল।

সাইকেল থেকে নেমে পড়েছিল চিকু। সাইকেলটা পাশে-পাশে হাঁটিয়ে ও চলে এল রোহনের সামনে।

রোহন বলল, 'বস, কথা আছে। বিশুদা, তিনটে ছোট চা বানাও তো!”

চায়ে আপত্তি করল না চিকু। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রোহনের পাশে বসে পড়ল ও।

অ্যাই, তুই নাকি জলাপুকুরের মার্ডারটা হতে দেখেছিস? জাঙ্গিকুলে পুরো কাউর হয়ে গেছে --।'

চিকু আবার বলতে শুরু করল। এ কদিনে গল্পটা বলে বলে ও বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে ব্যাপারটা খুটিনাটিসমেত বলতে ওর কেনও অসুবিধে হলো না, একবারের জন্যও হোঁচট খেল না।

গল্প শেষ হতেই ছোটকু চোখ বড়বড় করে বলে উঠল, 'আরিব্বাস। কী ভেঞ্জারাস কেস, বস!'

বিশুদা হা করে চিকুর গল্প শুনছিল। গরম চা উথলে পাতা উনুনে পড়তেই 'ছ্যাক' শব্দ হলো। বিশুদা চমকে উঠে উনুনের কাছে গেল। তিনটে কাপে চা ঢালতে লাগল।

রোহন চোখ ছোট করে ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর ও জিগ্যেস করল, 'মার্ডারারের গায়ে লোম ছিল? না কি ওভারকোট পরে ছিল?

বিশুদা ওদের চা এগিয়ে দিলো। | চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চিকু বলল, না, কোট বলে মনে হয়নি। তা ছাড়া কোট পরে ওই রাতে কি কেউ জলে ঝাঁপ দেয়!

চায়ে চুমুক দিয়ে 'হুম' করে ছোট্ট একটা শব্দ করল রোহন। তারপর তুই কি লোকটার মুখ দেখতে পেয়েছিলি?

না, শ্যাওলা আর কচুরিপানায় মুখটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তবে হাতের আঙুলে লম্বা-লম্বা বাঁকানো নখ ছিল। আমি স্পষ্ট দেখেছি।'

পুরো ব্যাপারটা ছদ্মবেশ হতে পারে, বুঝলি। ফাড়ির বড়বাবুকে আমি গতকাল সেটাই বলেছি। কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় জানিস? মার্ডারের মোটিভটাই কেউ বুঝতে পারছে না। একটা ভিখিরির কাছে আর কী-ই বা টাকাপয়সা থাকবে!

'সুড়ৎ' শব্দ করে চা শেষ করল ছোটকু। তারপর হাত-পা নেড়ে রোহনকে বলল, 'বস, এমন কেস নয়তো যে, লোকটা রাত্তিরবেলা খুন করা প্র্যাকটিস করছিল?

রেহন বিরক্তভাবে হাতের ইশারায় ছোটকুকে থামতে বলল। তারপর অনেকটা যেন আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, আমার এলাকায়

মার্ডার করে সিটকে পড়বে...এত বড় বুকের পাটা কার ?

চিকু রোহনকে দেখছিল। লম্বা-চওড়া ব্যায়াম করা চেহারা।

গায়ের রং মাজা। মাথায় ছোট-ছোট করে ছাঁটা চুল। চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। চোয়াল শক্ত। জামার নিচে বুকের মাসল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

চায়ের কাপটা ঠকাস করে নামিয়ে রেখে রোহন বলল, 'তুই এ ব্যাপারে আর কোনও খবর পেলে বা কিছু দেখলে আমাকে জানাবি।

চিকু ঘাড় কাত করে হা বলল। তারপর শেষ হয়ে যাওয়া চায়ের কাপটা বিশুদার হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সত্যিই তো! রোহনদা ঠিকই বলেছে। খুনের উদ্দেশ্যটাই তো কেউ বুঝতে পারছে না। তাহলে কি এ কোনও পাগল খুনীর কাজ? অনেক সিনেমায় যেমন দেখায়।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল চিকু।

পাঁচ

নাটোর মোড়ের কাছে মিস্টার ফক্স খেলা দেখাচ্ছিলেন।

পরনে একটা শতচ্ছিন্ন কালো রঙের কোট। তার নানান জায়গায় রঙিন কাপড়ের তালি মারা। কোটের ওপরে তেলচিটে ময়লার আস্তরণ। ফলে ঝকঝকে রোদে কোটটা চকচক করছে।

মিস্টার ফক্সের বয়েস কত কেউ জানে না। চিকু ছোটবেলা থেকেই দেখছে মিস্টার ফক্স পথে-পথে ঘুরে ভানুমতীর খেলা দেখান।

মিস্টার ফক্সের মাথায় কালো হ্যাট। বয়েসের ভাজ-পড়া মুখে পাউডার মাখা। চোখে সুর্মার টানা আর ঠোটে লিপস্টিক।

মিস্টার ফক্স একটা ছোট মাপের পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজাচ্ছিলেন, আর সেই তালে-তালে মাথা নাড়ছিলেন। তার সামনে বিশাল ঢোলা হাফ প্যান্ট পরা একটি ছেলে ডিগবাজির কসরত দেখাচ্ছিল। ওর নাম মাস্টার পটল।

অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে বাজাতে মিস্টার ফক্স হাঁক পেড়ে বলছিলেন, “ওয়েলকাম, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। দেখে যান মিস্টার ফক্সের শো। মিস্টার ফক্স দ্য গ্রেট ম্যাজিশিয়ান। জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের ছাত্র মিস্টার ফক্স। আপনাদের ডিগবাজির খেলা দেখাচ্ছে মাস্টার পটল। চলে আসুন... দেখে যান...দ্য গ্রেট শো অফ মিস্টার ফক্স।

অনেকে বলে মিস্টার ফক্সের মাথায় ছিট আছে। আর মাস্টার পটল তো হাবাগোবা আধপাগল!

ব্যাপারটা সত্যি বলেই মনে হয় চিকুর। নইলে দোলের দিন সকালে সে ভানুমতীর খেলা দেখাতে বেরোয়।

আজ দোল। পথে-ঘাটে অলিতে গলিতে শুধু রং খেলা চলছে। চিকুও রং খেলতে বেরিয়েছে রাস্তায়। খেলতে খেলতে নাটোর মোড়ের কাছে এসে দ্যাখে দোলের মধ্যেই মিস্টার ফক্সের ‘শো’ চলছে। মাস্টার পটল প্রাণপণে ডিগবাজি খেয়ে চলেছে।

মাস্টার পটলের বয়েস আঠেরো কি উনিশ হবে। গোলগাল মুখে বোঁচা নাক। চোখজোড়া চিনেম্যানদের মতো। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হলো ওর মাথার চুলের ছাঁট। ন্যাড়া মাথার চার-পাঁচ জায়গায় উলের বলের মতো এক থোকা করে চুল।

মিস্টার ফক্সের গায়ে অনেকে রং দিচ্ছে। মাস্টার পটলকে তাক করে কেউ-কেউ রং-ভরা বেলুন ছুড়ে মারছে | কিন্তু ওদের কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

‘আসুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান।

ইউনিক শো-ম্যান মিস্টার ফক্স, আর তার ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট মাস্টার পটল। ওঁদের ইউনিক খেলা দেখে যান। হোলির স্পেশাল অ্যাট্রাকশন! আসুন, আসুন...।'

আশেপাশে লেডিজ খুব একটা কে ছিল না। আট থেকে বারো-চোঙ্গো বয়েসের কয়েকটি রোগাসোগা রং-মাখা বালিকা কিংবা কিশোরী মাস্টার পটলে তুমুল ডিগবাজি দেখছিল। আর থেকেথেকেই হেসে উঠছিল, এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল।

পটলের ডিগবাজি শেষ হলেই মিস্টার ফক্স তার বিচিত্র খেলা শুরু করেন।

বলের হাতসাফাই, চার-পাঁচটা বল লোফালুফি, কোটের পকেট থেকে অদ্ভুদ রুমালের চেন বের করা, আস্ত সাপ জল দিয়ে গিলে নিয়ে আর বের করে দেওয়া, আরও কত কী!

পালা করে মিস্টার হল আর মিস্টার পটলের ভয় দেখানো খেলা চলতে থাকে।

তারই ফাকঁ-ফোকরে মিস্টার ফক্স ভিড় জমানো মানুষজনের কাছে আবেদন করে আমার খেলায় খুশি হয়ে যদি বখশিশ দিতে ইচ্ছে করে তাহলে দেন। পুয়োর ম্যান। প্লিজ হেল্প।

বাড়ির জানলায়, বারান্দায় কিংবা রাস্তায় মেয়েদের ভিড়। সেদিকে হাত পেতে মিস্টার ফক্স বলে ওঠেন, 'মা জননীরা একজন

আর্টিস্টকে হেল্প করুন।

আমি জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের ছাত্র মিস্টার ফক্স। আপনারা আমার মাদার এবং সিস্টার।

মিস্টার ফক্সের সামনে টুং-টাং পয়সা পড়ছিল।

মিস্টার পটল থ্যাংক ইউ বলে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিল। আর মিস্টার ফ্স টুপি খুলে মাথা ঝাকিয়ে সাহেবি কায়দায় দানকরীকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন।

দোলের দিন এই মজার খেলা সবাই উপভোগ করছিল। মিস্টার ফক্সের ভোজবাজির খেল এতই অদ্ভুত যে আগে বহুবার দেখা হলেও আবার দেখতে ইচ্ছা করে।

মাস দুয়েক আগেও মিস্টার ফক্সের সঙ্গে একটা বাদামী রঙের কুকুর থাকত—তার গলায় ফুলের মালা| কপালে লাল তিলক। নাম ছিল তুজ। বাজনার তালে-তালে দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে খেলা দেখাত।

কুকুরটি এখন নেই। লরি চাপা পড়ে মারা গেছে।

দুপুর একটা বেজে গেলে মিস্টার ফের যান। স্নান খাওয়াদাওয়া হলে আবার বেরোন খেলা দেখাতে।

তারপর সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে এলে পালা শেষ হয়।

শুধুমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া মিস্টার ফক্সের রোজই এক রুটিন। অসুখ-বিসুখ না হলে একটি দিনও কামই নেই।

দোলের দিন বিকেলেও মিস্টার ফক্সের খেলা চলল। সঙ্গে মাস্টার পটলের ডিগবাজি। মাস্টার পটলের মাথায়-মুখে গোলাপী আবির। যখন সে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হাসছে তখন কেমন অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী। তাকে ঘিরে জমজমাট ভিড়। সকালে যারা রাস্তায় বেরোয়নি তারাও এখন হাজির। মিস্টার ফক্সের ভানুমতীর খেলা সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে। ব

খেলার পালা শেষ হতে হতে সন্ধ্যে নামল। তারপর অন্ধকার।

তল্পিতলা গুটিয়ে মিস্টার ফক্স আর মাস্টার পটল আমবাগানের পথ ধরল।

মিস্টার ফক্সের একটু-আধটু নেশা করার অভ্যেস আছে। তাই আমবাগানের ভেতরে ঢুকে তিনি একটা বড়সড় গাছের গোড়ায় গুছিয়ে বসলেন। তারপর ম্যাজিকের সরঞ্জামের কালো গোলাম মাস্টার পটলের হাতে দিলেন। বললেন, ‘তুই যা, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কর গিয়ে। আমি ঘন্টাখানেক পরে যাচ্ছি। ও, কে?

অনুগতের মতো ঘাড় নাড়ল মাস্টার পটল। মাথায় দু’বর হাত বুলিয়ে ম্যাজিকের ঝোলাটা কাধে তুলে নিল। তারপর রওনা হলো আস্তানার দিকে। আস্তানা বলতে রেললাইনের ওপারে। হঠাৎই পূর্ণিমার গোল চাঁদটাকে দেখা গেল। ছোট-ছোট বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে গাছপালার আড়াল সরিয়ে হাজির হয়ে গেছে আকাশে।

করতালের আওয়াজ ভেসে আসছিল। দোলের উৎসব পালন করতে কীর্তনের দল পথে পথে বেরিয়ে পড়েছে।

মিস্টার ফক্স কোটের পকেট থেকে একটা ছোট মাপের বেতল বের করলেন। আমবাগানের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই। শুধু দুজন ম্যাজিশিয়ান হাজির এখানে মিস্টার ফক্স, আর আকাশে চাঁদ। চাঁদকে মিস্টার ফক্স ম্যাজিশিয়ান বলে মানেন। ছোটবেলায় বাবার কাছে যখন হাতসাফাইয়ের ম্যাজিক শিখতেন তখন বাবা বলতেন চাঁদ হচ্ছে এ ক্লাস ম্যাজিশিয়ান। সারা মাস ধরে

কেমন ছোট-বড় হওয়ার খেলা দেখায়। তারপর আবার ভ্যানিশ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এ-খেলা সে দেখিয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে! ভাবা যায়!

বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে চাঁদের দিকে তাকালেন মিস্টার ফক্স। কিন্তু দেখলেন, চাঁদটা আর নেই!

একটা কালো ছায়া চাঁদকে আড়াল করে দিয়েছে।

‘মিস্টার ফক্স, ভালো আছেন? কেমন যেন ভঙ্গ গলায় কালো ছায়াটা জিগ্যেস করল। মিস্টার ফক্স একটু অবাক হয়ে গেলেন। বহুদিন ধরে এই এলাকায় তিনি ম্যাজিক দেখান। তাই এলাকার মানুষজনদের মধ্যে অনেককেই চেনেন।

কিন্তু কারও সঙ্গেই খুব একটা আলাপ করেন না। বরং বলা যায় একটা দূরত্ব রেখে এড়িয়ে চলেন। এখন, এই জ্যোৎস্না রাতে, তাদেরই কেউ আচমকা এই নির্জন আমবাগানে এসে তার কুশল জিগেস করবে—এটা বেশ অস্বাভাবিক।

একটু সময় নিয়ে মিস্টার ফক্স বললেন, “হ্যা ভালো আছি। কিন্তু আপনি কে?

উত্তরে চাঁদের দিক থেকে ছায়াটা একটু পাশে সরে গেল। তখনই ওটা ছায়া থেকে কায়া হয়ে গেল। জ্যোৎস্নার আলো মানুষটার চোখেমুখে এসে পড়ায় মিস্টার ফক্স তাকে চিনতে পারলেন। এই এলাকারই পরিচিত, একজন মানুষ।

মিস্টার ফক্স অবাক হয়ে বললেন, আপনি?

মানুষটা কেমন ধরা গলায় বলল, “আপনাকে একটা ম্যাজিক দেখাতে এসেছি। এ-ম্যাজিকের কৌশল আপনিও জানেন না।

মিস্টার ফক্স অবাক চোখে মানুষটাকে দেখতে লাগলেন। তার কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল। তিনি কোনও কথা বলতে পারছিলেন না। শুধু ভাবছিলেন, এই লোকটা কি সত্যি ম্যাজিশিয়ান? কই, কখনও

তো এরকম শোনেননি! তা হলে নিশ্চয়ই মজা করছে।

‘এবার ভালো করে দেখুন...আমার ম্যাজিক শুরু হচ্ছে...।

সত্যি-সত্যিই যেন ম্যাজিক শুরু।

মানুষটা চওড়ায় বাড়তে লাগল। ওর জামা-প্যান্টের সেলাইগুলো সেই চাপে ফড়ফড় করে ছিড়ে যেতে লাগল। বোতামগুলো খই ফোটার মতো ছিটকে গেল এদিক-ওদিক। তারই সঙ্গে মানুষটার মুখ দিয়ে একটা পাশকি গর্জন বেরিয়ে এল।

ম্যাজিক তখনও চলছিল।

লোকটা মাথায় খানিকটা লম্বা হয়ে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ল—যেন ওর শিরদাড়াটা বেঁকে গেল। ওর চোয়ালটা কুকুরের মতো লম্বাটে হয়ে এগিয়ে এল সামনের দিকে। চোখ দুটো এতক্ষণ দেখা যায়নি—এবার দেখা গেল। হালকা সবুজ রঙের দুটো মার্বেল—অন্ধকার কোটরে। ধকধক করে জ্বলছে।

মানুষটা চোখের সামনে একটা লোমশ জন্তুতে বদলে গেল। তার হাতপায়ের আঙুলের ডগা থেকে বেরিয়ে এল হিংস্র বাঁকানো নখ। কান দুটো সূচলো হয়ে মাথাচাড়া দিল। মুখ হাঁ করতেই দেখা গেল ঝকঝকে দাঁতের সারি। তার মধ্যে শ্বদন্ত দুটো মিস্টার ফক্সের হতভম্ব চোখের সামনেই মাপে বড় হতে লাগল। | ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সত্যিই যেন এক অলৌকিক ম্যাজিক।

মানুষটা—অথবা, অমানুষটা শূন্যে হিংস্র কামড় দিয়ে হাঁ বন্ধ করল। 'খটাস শব্দ হলো। নির্জন রাত সেই শব্দে কেঁপে উঠল।

ভয়ঙ্কর নেকড়ে-মানুষটা যখন এক থাবার ঘায়ে মিস্টার ফক্সের চোয়ালের অর্ধেকটা উড়িয়ে দিল তখনও তার দুচোখ অবাক বিস্ময়ে এই নতুন ম্যাজিকটা দেখে চলেছে।

একটু পরে মিস্টার ফক্সের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ ফেলে রেখে অমানুষটা যখন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তখন মিস্টার ফক্সের ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখজোড়া বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। পূর্ণিমার চাঁদের দিকে।

এক ম্যাজিশিয়ান আর-এক ম্যাজিশিয়ানকে নিপ্রাণ চোখে প্রাণভরে দেখছে।

এবারের হইচইটা বেশ বড়সড় চেহারা নিল।

গত পূর্ণিমায় খুন হওয়া মানুষটা কারও চেনা ছিল না। এমনকী হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ তার আত্মীয়স্বজন কাউকেই খুঁজে পায়নি। কিন্তু মিস্টার ফক্সের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। তাকে সবাই চিনত। সাহেবি পোশাক পরা নিরীহ চেহারার এই মানুষটিকে সবাই পছন্দ করত। আর ছোট-বড় সকলের কাছেই ওর ম্যাজিকের আকর্ষণ ছিল চুম্বকের চেয়েও বেশি।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সবাই একমত হলো যে, দু-দুটো খুনই একই লোকের কাজ - যদিও অবশ্য খুনীকে আদৌ লোক বলা যায়।

জাঙ্গিকুল ফাঁড়ি থেকে বড়বার অবিনাশ মাইতি একজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে একদিন চলে এলেন চিকুনের বাড়িতে।

প্রথম খুনের ফাইলটা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খুনটা হওয়া পর সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া ফাইল আবার খুলতে হয়েছে। আর একইসঙ্গে তার কানে এ-খবরও পৌঁছেছে যে, প্রথম খুনটা চিকু নামে একটি ছেলে নিজের চোখে দেখেছে।

তার দু-চারদিন পরেই তিনি হাজি হয়েছেন চিকুদের বাড়িতে। কিন্তু চিকুয়ে নানান প্রশ্ন করেও তার সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। শুধু চিকুর জবানবন্দি তার ফাইলে গেঁথে দিয়েছেন।

খুনীর পরিচয় নিয়ে নানান জল্পনাকল্পনা আবার নতুন করে শুরু হলো।

কেউ বলল, খুনী কোনও ক্ষুধার্ত হিংস্র পশু।

তখন প্রশ্ন উঠল, তা হলে সে মৃতদেহটা ফেলে রেখে চলে গেল কেন?

কেউ বলল, খুনী পশুর মতো দৃশ্য কোনও মানুষ।

তখন প্রশ্ন উঠল, তা হলে খুনের উদ্দেশ্য কী?

কেউ-কেউ বলল, খুনী ভিনগ্রহের কোনও হিংস্র প্রাণী।

তাতে কে যেন জিগ্যেস করল, এ মহাকাশযানটা তা হলে কোথায় নেমেছিল? একটা মহাকাশযান কি সকলের চোখের আড়ালে নামা সম্ভব।

হরিহরবাবুর বাংলা কোচিং-এ গিয়ে চিকুরা জোর আলোচনায় মেতে ওঠে আর সেই আলোচনায় চিকুই হলো মধ্যমণি—কারণ, প্রথম খুনটা দেখার সুবাদে ও এখন বিখ্যাত হয়ে পড়েছে।

হরিবাবু ঘরে এসে ঢুকতেই ওদের মশা গুঞ্জন চোখের পলকে থেমে গেল। হরিবাবুর বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুল ধবধবে সাদা, তবে গোফ কাচা-পাকা। লম্বা রোগা চেহারা। তার গাল সামান্য ভাঙ্গা। টানা-টানা চোখ শান্ত। চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা। ভাজ-পাড়া কপালে ছোট্ট চন্দনের টিপ। গলায় গোলমরিচের দানার মাপের ফুলের মালা। পাঞ্জাবির গলার কাছে মালার খানিকটা উকি দিচ্ছে।

হরিহরবাবু ধার্মিক মানুষ। ধর্মগ্রন্থ পড়া তার নেশা। বাংলা পড়াতে-পড়াতে প্রায়ই সংস্কৃত সাহিত্যের উদাহরণে চলে যান। তবে চিকুদের কখনওই একঘেয়ে লাগে না। স্যারের পড়ানোটা এত সুন্দর যে, ভীষণ কাছে টানে।

হারিহরবাবু মেঝেতে গুছিয়ে বসলেন, তারপর কৌশিককে লক্ষ্য করে বললেন, -কৌশিক, পাখার রেগুলেটারটা এক পয়েন্ট কমিয়ে দে তো। আমার কেমন কেমন শীত শীত করছে।

বারকয়েক কাশলেন হরিহরবাবু। ওঁর একটু কাশির ধাত আছে। | কৌশিক রেগুলেটার ঘুরিয়ে জায়গামতো বসে পড়তেই হরিহরবাবু পড়াতে শুরু করলেন।

‘এবার তোদের গা ঝাড়া দিয়ে বসতে হবে। সামনের বছরটা পেরোলেই বলতে গেলে মাধ্যমিক। রেজাল্ট যেন সবার ভালো হয়। নইলে আমার বদনাম হয়ে যাবে। নে, খাতা-পেন নিয়ে সব রেডি হয়ে নে। আজ আমরা পড়ব ভারতচন্দ্রের “অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি”। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। সেই রাজার

অনুরোধে লিখেছিলেন "অন্নদামঙ্গল কাব্য। এজন্য রায়গুণাকর উপাধি পেয়েছিলেন। এই "অন্নদামঙ্গল"-এর একটা অংশ

"অয়পুর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি"

চিকুরা সবাই ঘাড় নাড়ল। এরপর হরিহরবাবু শ্রাবণীকে জোরে-জোরে পড়তে বললেন। কবিতা পড়া শেষ হলে তিনি আলোচনা শুরু করলেন।

এই জায়গাটা খেয়াল দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনিকে তাঁর স্বামীর পরিচয় দিচ্ছেন। যেহেতু সে-সময়ে স্ত্রীরা স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করত না সেহেতু দেবী তার স্বামী মহাদেবের পরিচয় দিতে গিয়ে কৌশল করে বলছেন?

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন। কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।" দেবী এখানে স্বামীর নিন্দার ছলে তার গুণের কথা বলছেন। তার স্বামী মহাদেব "বৃদ্ধ মানে আসলে জ্ঞানবৃদ্ধ। দেবী বলছেন তিনি "সিদ্ধিতে নিপুণ"। এর একটা অর্থ হলো মহাদেব সিদ্ধির নেশা করেন। আর আসল অর্থ হলো, তিনি যোগসিদ্ধ পুরুষ। এরপর 'কপালে আগুন"| মহাদেবের কপালে একটি চোখ আছে। রেগে গেলে সেই চোখ দিয়ে আগুন ঝরে...।'

পড়ানো চলতে লাগল।

তারই মাঝে কাকিমা এসে স্যারকে চা-বিস্কুট দিয়ে গেলেন। আর ওদের জন্য একটা প্লেটে আটটা সিঙাড়া রেখে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'তোমরা পড়ার ফাকে-ফাকে খেয়ে নিয়ো কিন্তু।

পড়ানোর সময় যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে হঠাৎ করেই তিতুন আর প্রদীপ্ত মিস্টার ফক্সের খুন হওয়ার কথাটা তুলল।

হরিহরবাবু নমস্কারের ভঙ্গিতে কপালে আঙুল ছোঁয়ালেন। তারপর মন দিয়ে ওদের কাছ থেকে দোলপূর্ণিমার খুনের ঘটনাটা শুনতে

লাগলেন।

শোনা শেষ হলে তিনি একটু কেশে নিয়ে বললেন, হ্যা, ব্যাপারটা আমি

শুনেছি। তোরা ওসবে মাথা ঘামাস না। | বোধহয় কুকুর-টুকুরের কাজ।'

চিকু আর চুপ করে থাকতে পারল না। প্রতিবাদের গলায় বলে উঠল, না, স্যার, কুকুর নয়। ওই হিংস্র জানোয়ারটাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

হরিহর আগ্রহ নিয়ে চিকুর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইলেন।

তারপর বললেন, 'আগেই কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছিল। এখন ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। তবে জানোয়ারটা ঠিক কী ধরনের সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

“অনেকটা মানুষের মতে, স্যার। চিকু উত্তেজিত হয়ে বলল। “মানুষের মতো।

হ্যা, স্যার—তবে মাপে অনেক বড়। গায়েও নিশ্চয়ই অনেক জোর হবে। হাতের নখগুলো লম্বা-লম্বা, বাকানো...।

হরিহরবাবু কেমন যেন বিব্রত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ কী ভাবলেন—তারপর বললেন, “এ যেন শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহ অবতার! ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করতে নৃসিংহ অবতার সেজে ভগবান হিরণ্যকশিপুকে নিধন করেছিলেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য...।

শ্লোকটা শেষ করে স্যার বললেন, ...বলা তো যায় না, যে-দুজন মানুষ খুন হয়েছে তারা হয়তো ভালো লোক ছিল না।

সেইজন্যেই ভগবান পশুর রূপ ধরে তাদের কিনাশ করেছেন।'

কথা শেষ করতে করতে কপালে আঙুল ছোঁয়ালেন হরিহরবাবু। বোধহয় ভগবানকে প্রণাম জানালেন।

চিকুর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল স্যারের ব্যাখ্যা ওর পছন্দ হয়নি।

ওরা চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

সাত

পরের পূর্ণিমায় আর-একটা খুন হতেই ত্রাসের ভয়ঙ্কর ছায়া নেমে এল

জাঙ্গিকুলে। নানান গুঞ্জন, আলোচনা আর বিশ্লেষণ থেকে পূর্ণিমার সঙ্গে খুনের সম্পর্কের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে গেল। সবাই বলল, পূর্ণিমার রাতেই খুনীর মাথায় খুনের পাগলামি দেখা দেয়।

এবারে খুন হলেন একজন বিধবা ভদ্রমহিলা।

রাত সাড়ে ন'টার সময় তিনি সাইকেল-রিকশা করে ফিরছিলেন। জাঙ্গি কুলের একমাত্র নার্সিংহোম ‘আরোগ্য নিকেতন'-এর কাছাকাছি এসে। রিকশাওয়ালা দেখতে পায় পথের ওপরে। একটা মাঝারি মাপের গাছের গুড়ি আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। রিকশাওয়ালা বেশ অবাক হয়ে যায়। কারণ, কাচা রাস্তার ওপরে গাছের গুড়ি ফেলে কে আর ডাকাতির চেষ্টা করে! সাইকেল-রিকশা থামিয়ে ক’পয়সাই বা পাওয়া যাবে।

এইসব কথা আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে সে রিকশা থেকে নেমে পড়ে। তারপর গাছের গুড়িটা সরাতে এগিয়ে যায়।

ঠিক তখনই পাশের একটা পোড়া জমির অন্ধকার আগাছার জঙ্গল থেকে একটা পাশবিক গর্জন ভেসে আসে।

রিকশাওয়ালা আর দেরি করেনি। আগের দু-দুটো খুনের কথা তার বেশ মনে ছিল। সুতরাং একমাত্র আরোহীকে রিকশায় ফেলে রেখে সে প্রাণপণে ছুট লাগায়।

তখন গর্জনটা কাছে এগিয়ে আসতে

আরোহী ভদ্রমহিলার আর কিছু করার ছিল না।

পরদিন ভদ্রমহিলার ছিন্নভিন্ন দেহটা বিভৎস অবস্থায় পাওয়া গেল। সেইসঙ্গে পাওয়া গেল সাইকেল-রিকশাটার ধ্বংসাবশেষ।

পঞ্চাশতলা একটা বাড়ির ছাদ থেকে রিকশাটা আছড়ে পড়লে সেটার যে-দশা হতো কেউ স্রেফ গায়ের জোরে রিকশাটার সেই হাল করেছে। যেন রাগে আক্রোশে অন্ধ হয়ে কোনও ক্ষিপ্ত জানোয়ার রিকশাটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার চেষ্টা করেছে।

এই খুনটার পর খুনীর পরিচয় নিয়ে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। খুনী কি কোনও পশু, না কি মানুষ?

এতদিন অনেকেরই ধারণা ছিল খুনী কোনও শক্তিশালী পশু। কিন্তু পশু কি বুদ্ধি খাটিয়ে পথের মাঝে গাছের গুড়ি ফেলে রাখতে পারে। তা হলে খুনী নিশ্চয়ই পশুর আড়ালে কোনও মানুষ।

সুতরাং পূর্ণিমার সঙ্গে সম্পর্কটা সকলে মেনে নিলেও খুনীর পরিচয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতেই লাগল।

থানার বড়বাবু বেশ ফাপরে পড়লেন। মৃতদেহ নিয়ে নিয়মমাফিক দায়দায়িত্ব পালন করার পর আর কিছু করার আছে কি না সেটাই ভাবছিলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, এই খুনের তদন্তের ফলাফল হবে ঠিক আগের খুন দুটোর মতোই। | রোহনরা কিন্তু প্রায় খেপে উঠল। কিছু একটা করার জন্য ওরা অস্থিরভাবে ছটফট করতে লাগল। এলাকার লোককে সতর্ক করার প্রথম ধাপ হিসেবে ওরা মাইক দিয়ে প্রচার শুরু করল। সাইকেল-রিকশায় ব্যাটারি আর মাইক লাগিয়ে রোহনের দলের দু-চারজন এলাকায় ঘুরতে লাগল।

রোহনদের ঘোষণা শুনতে-শুনতে চিকুর মনে হচ্ছিল, ভোট এসে গেছে। আর মাইকে ঘোষণা কে করছে কে জানে। 'স'গুলো সব ইংরেজি ‘এস'-এর মতো করে উচ্চারণ করছে। তবে রোহনদের দলের বেশিরভাগই ‘স্যামবাজারের সসীবাবু।

মাইকে তখন শোনা যাচ্ছিলঃ ‘পূর্ণিমার রাতে সন্ধ্যের পর সবাই সাবধানে থাকবেন। একা-একা রাস্তায় বেরোবেন না। বিপদ হতে পারে। পল্লীবাসীগণ, আপনারা জানেন, গত তিন-তিনটে পূর্ণিমায় আমাদের এলাকায় তিন-তিনটে খুন হয়ে গেছে। তাই আপনাদের সাবধান করে বলছি, আগামী পূর্ণিমার রাতে রাস্তায় কেউ বেরোবেন না।

সন্ধ্যের পর সবাই সাবধানে থাকবেন...নইলে বিপদ হতে পারে।... পল্লীবাসীগণ, আপনারা জানেন...।'

শুধু যে মাইকে প্রচার তা-ই নয়, রোহনরা ঠিক করল পরের পূর্ণিমার রাতে ওরা আর্মস নিয়ে এলাকায় টহল দেবে। সে-কথা চিকু জানতে পারল ছোটকুর কাছে। ছোটকু তখন যথারীতি বিশুদার চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল।

চিকুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছোটকু হঠাৎ বিশুদার দিকে তাকি মন্তব্য করল, “বিশুদা, তুমি রাতে দোকানে আর থেকো না। মানে, পূর্ণিমার রাতে কারও পাকা বাড়িতে গিয়ে শেলটার নিয়ো। এ-খুনীকে বিশ্বাস নাই।

উত্তরে বিশুদা একগাল হেসে জবাব দিল, “আমার কী আছে যে আমাকে কেউ খুন করবে? আমাকে যমেও নেবে না।

কিন্তু পূর্ণিমা যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই বিশুদার সাহস কমতে লাগল। শুধু বিশুদা কেন, জাঙ্গিকুলের প্রায় সকলেই ভাবতে লাগল, এবার কার পালা?

সুতরাং পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যে হতে হতেই রাস্তাঘাটে লোকজন কমে গেল। সময়টা গ্রীষ্মকাল হলেও সাতটা-সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতে দোকানপাটের ঝাপ পড়ে গেল ঝপাঝপ। ফলে রাত আটটার সময় মনে হলো যেন রাত। বারোটা বেজে গেছে। শুধু শিবতলার হর-পার্বতীর মন্দিরটাই ছিল ব্যতিক্রম | আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। আকাশের চাঁদ বুদ্ধের মতোই শান্ত, ধ্যানে মগ্ন। তবু মনে হয় যেন সে ভয়ঙ্কর কোনও

কিছু জন্য অপেক্ষা করছে।

হর-পার্বতীর মন্দিরে ঘণ্টা বাজছিল। | চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত আর কোনও শব্দ না

থাকায় সেই ঘণ্টার শব্দের রেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত কানে লেগে রইল।

মন্দিরের ভেতরে পুরুতমশাই পূজে করছিলেন। অথচ পুজো দেখার জন্য আজ আর কেউ বসে নেই। ভয় এমন জিনিস। দেবতার চেয়েও ভয়কে বেশ সমীহ করে মানুষ। আজ তা হলে কে-ইবা প্রসাদ নেবে, আর কে-ইব নেবে শান্তির জল!

পুরুতমশাই ঠিক খেয়াল করেননি। তিনি দেবতার আরতিতে ব্যস্ত ছিলেন। একজন ভক্ত মন্দিরের দরজায় মসৃণ

পাথরের ওপরে বসে ছিল। দু-চোখে তার মুগ্ধ দৃষ্টি। ভক্তির আবেগে চোখের কোন বেয়ে নেমেছে জলের ধারা।

দেবতার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল সে। পুজো শেষ করে পুরুতমশাই পিছনে ফিরতেই তাকে দেখতে পেলেন। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। আজ মন্দিরের বারান্দা, শান-ধাঁধানো চাতাল, সব খাঁ-খাঁ করছে। অথচ অন্যান্য দিন কত ভক্ত সেখানে ভিড় করে থাকে!

প্রদীপ নিয়ে এই সাহসী ভক্তের কাছে এলেন পুরুতমশাই। লোকটি উঠে দাড়িয়ে প্রদীপ-শিখার তাপ নিয়ে মাথায় বোলালেন।

পুরুতমশাই অবাক হয়ে বললেন, এ কি আপনি! আজ কেউ আসেনি - অথচ আপনি এসেছেন।' হাসলেন গুরুতমশাই ? আপনার কি ভয়ডর নেই।

উত্তরে ভক্ত স্মিত হেসে বলল, আমার কাছে ভয়ের চেয়ে ভগবানের টান বেশি। মুক্তির আশায়-আশায় আমি খ্যাপা কুকুরের মতো এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে ঘুরে বেড়াই....।

মুক্তি কি অত সহজে পাওয়া যায়। আমরা সবাই তো মুক্তির আশাতেই বসে আছি।

পুরুতমশাইকে পাশ কাটিয়ে ভক্ত দেবতার মূর্তির দিকে দু-পা এগিয়ে গেল। মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল।

তারপর গড় হয়ে প্রণাম করে আবেগভরা গলায় বলে উঠল, "আমায় মুক্তি দাও, ভগবান—এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দাও....।

পুরুতমশাই খানিকটা করুণার চোখে কষ্ট পাওয়া ভক্তকে দেখছিলেন।

আর ভাবছিলেন এর জীবন অভিশপ্ত কেন?

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন।

উক্ত মানুষটি তখনও গড় হয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা ঝুকিয়ে ঠাকুরকে ডাকছিলেন। সেই অবস্থাতেই তার শরীরটা ফুলতে শুরু করল। আর তার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসতে লাগল পশুর গোঙানি।

কয়েক সেকেন্ড পর সেই মানুষটা, কিংবা অমানুষটা, সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল পুরুতমশাইয়ের দিকে।

পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে হতভম্ব পুরুতমশাই তার বদলে যাওয়া ভক্তকে দেখছিলেন।

কী ভয়ঙ্কর বীভৎস চেহারা! ঘন কালো লোমে ঢাকা কোনও আদিম মানুষ যেন! হিংস্র চোয়াল পশুর মতো লম্বাটে। দু-পাটি ধারালো দাঁত আলো পড়ে ঝকঝক করছে। দাঁত থেকে সুতোর মতো সরু হয়ে লালা ঝরে পড়ছে।

অমানুষটা সামান্য কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটু দুটো কিছুটা ভজ হয়ে থাকায় পা দুটো টানটান সোজা হতে পারছে না। দুটো লোমশ হাত দু'পাশে ঝুলছে। হাতের আঙুল বাঁকানো, নখও একইরকম। | প্রাণীটা পুরুতমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। দুটো হলদে-সবুজ চোখ। নিশাচর পশুর মতো জ্বলজুল করছে। অথচ সেই চোখে মানুষের মতো দৃষ্টি।

পুরুতমশাই বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু সামনে এসে দাড়িয়েছে। অপেক্ষা করছে।

তাই তিনি আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না।

অমানুষটাকে অবাক করে দিয়ে তার শরীরের উপরে ঝাপিয়ে পড়লেন দুঃসাহসী পুরুতমশাই। জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপটা চেপে ধরলেন তার মুখে “শয়তান।

বীভৎস রক্ত হিম করা গর্জন শোনা গেল। নাকে এল লোম এবং চামড়া পুড়ে যাওয়ার গন্ধ।

পুরুতমশাই তখন পাগলের মতো ধস্তাধস্তি করছিলেন আর চিৎকার করছিলেন, ‘তুই পাপী! তুই ছদ্মবেশী পাপী! ভগবান তোকে বিনাশ করবে!

অমানুষটা বোধহয় কথা বলতে চাইল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে শুধুই পাশবিক গর্জন বেরিয়ে এল। এক ঝটকায় সে পুরুতমশাইয়ের দেহটা সজোরে ছিটকে দিল শ্বেতপাথরের দেওয়ালে। পিতলের পঞ্চপ্রদীপ

দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ঠং-ঠং করে ধাতব শব্দ হলো। আর তার ঠিক পাশাপাশি শোনা গেল একটা ভোঁ শব্দ। পুরুতমশাইয়ের ভারী দেহটা ঠিকরে পড়েছে মেঝেতে।।

যন্ত্রণায় গজরাতে-গজরাতে পুরুতমশাইয়ের কাছে এগিয়ে এল প্রাণীটা। সামান্য ঝুকে পড়ে নিথর দেহটা অবলীলায় তুলে নিল। তারপর পশুর মতো ক্ষিপ্রতায় শ্বেতপাথরের বারান্দা পেরিয়ে মন্দিরের শান বাঁধানো চত্বরে লাফিয়ে নেমে এল।

প্রাণিটা এবার রাতের আকাশের দিকে মুখ তুলল। তাকাল পূর্ণিমার চাঁদের দিকে। তারপর এক আকুল দীর্ঘ গর্জনে আকাশ বাতাস কাপিয়ে দিল।

জাঙ্গিকুলের অনেকেই শুনতে পেল সেই গান।

রোহনরাও শুনতে পেল।

ওরা তখন রাজবাড়ির কাছাকাছি ছিল। গর্জনটা শুনতে পেয়েই শব্দের নিশানা ধরে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতেই রোহন কোমর থেকে রিভলবার বের করে নিল।

কলাপুকুর, দেশপ্রিয় সুইটস, বিশুদার চায়ের দোকান পেরিয়ে ওরা মিনিটখানেকের মধ্যেই পৌছে গেল শিবতলার হর-পার্বতীর মন্দিরের কাছাকাছি।

এদিক থেকেই তো গর্জনটা এসেছে বলে মনে হলো!

অথচ চারদিক শুনশান, চুপচাপ।

শুধু আশপাশের দু-একটা বাড়ির বারান্দায় কৌতুহলী কয়েকটা মুখ দেখা গেল। সবকটা মুখই ভয়ে ফ্যাকাসে।

মন্দিরের দিকে চোখ পড়ল রোহনের।

শানবাঁধানো চত্বরে ঢোকার গ্রিলের দরজাটা হুড়কো দিয়ে আটকানো। তবে মূল মন্দিরটা খানিকটা উচুতে হওয়ায় রাস্তা থেকেই ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দরজা হাট করে খোলা। ঝকঝকে আলোয় দেবতার মূর্তি প্রাণবন্ত। উজ্জল। অথচ পুরুতমশাইকে দেখা

যাচ্ছে না।

গোটা মন্দিরটা কেমন যেন নিঝুম।

ঠিক কোথা থেকে ভেসে এল গির্জনটা?

কিছুক্ষণ এলোমেলো খোজাখুজির পর বোহনের কেমন যেন সন্দেহ হলো। পুরুতমশাইকে দেখা যাচ্ছে না কেন? অথচ ঘন্টাখানেক আগে এ-পথ দিয়ে টহল দেওয়ার সময় রোহনরা তাকে দেখেছে। তাকে জিগ্যেস করলে হয়তো গর্জনটার কোনও হদিস পাওয়া যেতে পারে।

রোহন রিভলবার উচিয়ে ধরল। ওর সঙ্গে যে আরও চারজন শাগরেদ ছিল তারাও নিরস্ত্র নয়। কারও হাতে রড, কারও হাতে ভোজালি। এরা সবাই তৈরি। খুনীকে হাতের কাছে পেলে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।

ওরা মন্দিরের গ্রিলের দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

গ্রিলের গেট খুলে রোহনরা মন্দিরের শান-বধানো চত্বরে ঢুকে পড়ল। এবং পুরুতমশাইকে ওরা খুঁজে পেল।

মন্দিরের চত্বরে বেশ কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আর শিমূল গাছ রয়েছে। তাদের গোড়াগুলো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে বেণীর মতো করা। বেশিরভাগ সময় ভক্তরা এখানে বসে থাকে, নামকীর্তন শোনে।

সেইরকমই একটা বেণীর ওপরে পুরুতমশাইয়ের ছিন্নভিন্ন দেহটা শোয়ানো। মাথাটা বেদী ছাড়িয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। হাঁ-করা মুখ দিয়ে ফোটা-ফোটা রক্ত পড়ছে।

গোটা বেদীটা রক্তে মাখামাখি। রক্তের দাগ গড়িয়ে এসেছে নিচে। শানবাঁধানো চত্বরে রক্তের ধারা তৈরি হয়ে গেছে। রক্তের ছাপ চত্বরের নানান জায়গায়, মন্দিরের সিঁড়িতে, এমনকী মন্দিরের ভেতরেও।

রোহনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। এরকম দুঃসাহসী খুনী! দেবতার সামনে খুন করতেও সে ভয় পায় না।

খুনী আশপাশে কোথাও লুকিয়ে নেই।

রোহনরা মন্দিরের প্রতিটি জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। ওদের বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল। একইসঙ্গে রোহনের ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এত চেষ্টা করেও খুনিটাকে ওরা ঠেকাতে পারল না।

মন্দিরের ভেতরে অবহেলায় পড়ে থাকা পঞ্চপ্রদীপটা রোহনের চোখে পড়েছিল। সেটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখল ও। প্রদীপের তেলের গায়ে কয়েক গোছা লোম লেপটে রয়েছে।

খুটিয়ে নজর করতেই ও দেখল, বেশ কয়েকটা লোম আধপোড়া। তা হলে কি পঞ্চপ্রদীপের আগুনে খুনীর গায়ের লোম পুড়ে গেছে। পুরুতমশাইয়ের সঙ্গে খুনীর কি ধস্তাধস্তি হয়েছে?

ঠিক তখনই রোহনের এক শাগরেদ নান্টু মেঝেতে ঝুঁকে পড়ে কী যেন তুলে নিল। তারপর রোহনকে ডেকে বলল, এগুলো কী দ্যাখো তো, রোহনদা।”

রোহন কাছে এসে ভালো করে দেখল।

মটরদানার মতো গোল-গোল তিনটে বিচি। সেগুলোয় ফুটো করে মালা গাথা ছিল। খুলে পড়ে গেছে।

রোহন বিচিগুলো নিয়ে পকেটে রাখল। ওর কপালে চিন্তার ভাজ।

মন্দিরের ভেতরেও অল্পবিস্তর রক্তের ছাপ ছিল। কিন্তু কোনও ছাপই হাতে কিংবা পায়ের বলে স্পষ্ট চেনা যায় না।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রেহাই খুনীর কোনও চিহ্ন পেল না। কেউ কোথাও নেই। মন্দিরের পিছন দিকে একটা পোড়ো জমি আছে—গাছপালা আর কাটাঝোপে ভরা। খুনী হয়তো সেদিক দিয়ে সরে পড়েছে।

হতাশ হয়ে রোহনরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। দেখল কয়েকজন কৌতূহলী মানুষ সাহস করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাদেরই একজন রোহনের কাছে এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, রোহন ? গর্জনটা কীসের কিছু বুঝতে পারলে?'

রোহন ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে না বলল। তারপর ? পুরুতমশাই খুন

হয়েছেন। আমরা ফাড়িতে খবর দিতে যাচ্ছি ।'

রোহনের বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে রোহন আর ছোটকু রওনা হলো থানার দিকে।

যেতে-যেতে ছোটকু বলল, ‘বস, আজ হেভি প্রেস্টিজে লাগল মাইরি। আমাদের এরিয়ায় নাকের ডগায় মার্ডার করে মার্ডারার হাওয়া হয়ে গেল।

রোহন ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল। এর ভেতরে অপমানটা টগবগ করে ফুটছিল।

আট

স্কুলের লাগোয়া এক অপরূপ বাগানে হরিহরবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাগানে ঝকঝকে সবুজ সব ফুলের গাছ। তাতে ফুটে রয়েছে নানান রঙিন ফুল। সেই ফুলের মেলার মাঝে আরও এক ঝাক রঙিন ফুল ছুটোছুটি করছিল। একদল ছেলে-মেয়ে।

ওরা এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করছে। নিজেদের মধ্যে হইচই কলরব তুলে বাগানটাকে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে ফুলের মতো স্কুলপড়ুয়ার দল। বাগানের একটা বেণীতে বসে মুগ্ধ চোখে

ওদের দেখছিলেন হরিহরবাবু। তার কোনও ছেলেমেয়ে নেই। তবে তার কোনও দুঃখও নেই। ছাত্র-ছাত্রীরাই তার সন্তান।

বিকেলের রোদ মরে এসেছিল। কিন্তু এর ছায়া তখনও নামেনি। হরিহরবাবু দেখলেন, দূরে, পশ্চিম সিমান্তে, তালগাছের সারির ফাঁক দিয়ে চাঁদ উকি দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ।

ছুটোছুটি করা ছেলেমেয়ের দলও

চাঁদ দেখতে পেল।

কী যে হলো, হঠাৎই ওরা খেলাধুলো ছেড়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সবাই একইসঙ্গে হাঁ করে তাকাল পূর্ণিমার চাঁদের দিকে। " হরিহরবাবু বেদী ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওরা সবাই কেন অবাক হয়ে চাঁ দেখছে সেটা বুঝতে চেষ্টা করলেন।

ওদের নিস্পাপ মুখগুলো দেখছিলেন হরিহরবাবু। না, ওরা ফুল নয় বরং ফুলের চেয়ে কিছু বেশি। ছোটবেলার মতো দারুণ জিনিস আর হয় না!

আর ঠিক তখনই একটা ভয়ঙ্কর। ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

ছেলে-মেয়েগুলোর মুখ বদলে যেতে লাগল।

নিস্পাপ মুখগুলো বিকৃত হয়ে জন্তুর চেহারা নিল। চোয়াল লম্বাটে

হয়ে গেল। সারি সারি ধারালো দাঁত তৈরি হয়ে গেল সেখানে। হাতে-পায়ে-ঘাড়ে লোম গজিয়ে উঠল। কানের ওপর দিকটা ছুচলো হয়ে গেল।

তারপর ওরা সমস্বরে এক দীর্ঘ গর্জন তুলে আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিল।

হরিহরাবু দুয়ে কঁপছিলেন আর কুলকুল করে ঘামছিলেন।

উৎকার শেষ করে ছেলে-মেয়েগুলো হরবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এক পাশবিক স্বরে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে...' সুর করে গাইতে শুরু করল। যেন স্কুলের প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইছে।

এবং ওরা হরিহরবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

হরিহরবাবু বাঁশপাতার মতো কাপতে শুরু করলেন। একইসঙ্গে মৃত্যুর প্রহর গুনতে লাগলেন। ঠিক তখনই তার ঘুমটা ভেঙে গেল।

উঃ, কী বিশ্রী স্বপ্ন।

সারা শরীর ঘামে ভেজা। বিছানার চাদরটাও ভিজে গেছে। অবসন্ন চোখে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালেন হরিহরবাবু। সন্ধ্যে প্রায় ছ'টা।

আর ঠিক তখনই স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। তার মাথার কাছটিতে দাঁড়িয়ে মুখে কৌতুকের হাসি।

'সেই তখন থেকে ডাকছি। ওরা সব পড়তে এসে গেছে।'

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন হরিহরবাবু। দেওয়ালে টাঙানো মা কালীর ফটোর দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকালেন। মা—মা-গো !

'ঘুমের মধ্যে অমন গোঙচ্ছিলে কেন? তোমাকে কি বোবায় ধরেছিল?

কে জানে।' বিছানা থেকে নেমে পড়লেন হরিহরবাবু। আসলে একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন...।

তোমার তো আবার অল্পতেই ভয়।' হরিহরবাবুর স্ত্রী হাসলেন ! 'শরীর ভালো না লাগলে আজ আর পড়াতে হবে না।'

হরিহরবাবু প্রস্তাবটাকে আমলই দিলেন না। কোচিং ক্লাস কামাই করা তিনি একেবারে পছন্দ করেন না।

পোশাক পালটে নিয়ে বাইরের ঘরে এলেন তিনি। চিকু, প্রিয়াংকা, কৌশিকের দল হাজির। ওদের দিকে একপলক তাকিয়েই দুঃস্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। সংকোচের হাসি হেসে বললেন, 'দুপুরের ঘুমটা একটু লম্বা হয়ে গেছে।'

চিকু হাঁ করে হরিহরবাবুকে দেখছিল। ওর শরীরের ভেতরে শিরায়শিরায় বরফকুচির স্রোত বইতে শুরু করল। ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছিল।

চিকু টলে পড়ে যাচ্ছিল। কোনও রকমে পাশে বসা প্রিয়াংকাকে ধরে নিজেকে সামলে নিল।

প্রিয়াংকা টের পেল চিকুর হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা। ও অবাক হয়ে টিকুর চোখে তাকাল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?

চিকুও নিচু গলায় জবাব দিল, আমি সব বুঝতে পেরে গেছি।

"কী বুঝতে পেরেছ?'

চিকু কোনও উত্তর দিল না। চোখের ইশারায় হরিহরবাবুকে দেখাল। তারপর ডানহাতের দুটো আঙুল উঁজি করে আর দুটো আঙুল টানটান করে রিভলবারের আদল তৈরি করল। সেই 'রিভলবারটা স্যারের দিকে তাক করে মুখে চাপা শব্দ করে স্যারকে মিছিমিছি 'গুলি করল চিকু।

প্রিয়াংকা কিছু বুঝতে না পেরে ঠোট উলটে প্রশ্নের ভঙ্গি করল।

চিকু হেসে বলল, 'এখন আগে পড়া শেষ হোক—তারপর। তুমি আমার সঙ্গে থেকো তা হলে সব বুঝতে পারবে।

চিকুর উসখুস ভাবটা হরিহরবাবু লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'চিকু, কিছু বলবি?' চিকু মাথা নাড়ল 'না, স্যার।' প্রিয়াংকার সঙ্গে কী কথা বলছিস?'

হরিহরবাবুর কৌতূহলটা চিকুর কানে বড় বাড়াবাড়িরকম ঠেকল।

তাই ও অম্লানবদনে বলে বসল, পুরুতমশাইয়ের মার্ডারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, সার।'

বুদ্ধপূর্ণিমার পর মাত্র তিনটে দিন পার হয়েছে। পুরুতমশাইয়ের হত্যাকাণ্ড জাঙ্গিকুলের ছোট-বড় সবাইকে একেবারে ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছে। লোকজনের কথাবার্তা আলোচনায় এখন থেকেই

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আগামী পূর্ণিমায় সন্ধ্যে হলেই যে-যার ঘরে ঢুকে পড়বে। দরজায় খিল এটে নিরাপদ আশ্রয়ে বসে থাকবে। অপঘাতে কেউ আর মরতে চাইবে না।

চিকুর কথায় কোচিং সরগম হয়ে

উঠল। সকলেই পূর্ণিমার খুনগুলো নিয়ে নানান মন্তব্য করতে লাগল।

হরিহরবাবু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করলেন। একটু কেশে দিয়ে বললেন, 'শোন, এই খুনগুলো নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি। তোদের তো আগে একদিন বলেছি, এ যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহ অবতার। তা ছাড়া, যারা খুন হয়েছে তাদের সবারই নিয়তি ছিল মৃত্যু। তবে জানবি, তাদের আত্মার মৃত্যু হয়নি। গীতায় আছে, আত্মা

অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয়। আত্মার জমও নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মার আসল রূপ হলো....।

চিকু স্যারের কথা শুনছিল। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই ওর হাসি পাচ্ছিল। | কারণ রোহনদার কথাগুলো ওর মনে পড়ছিল।

বুদ্ধপূর্ণিমার পরের দিন বিকেলে রোহনের সঙ্গে চিকু দেখা করেছিল। দেখা করার জন্য রোহনই ওকে খবর পাঠিয়েছিল।

বিশুদার চায়ের দোকানে বসে মন্দিরের খুন নিয়ে চিকুর সঙ্গে আলোচনা করেছিল রোহন। তারপর মন্দির থেকে পাওয়া মটরদানার মতো তিনটে বিচি চিকুকে দেখিয়েছিল।

‘এগুলো কী বল তো। সকাল থেকে অনেককে দেখিয়েছি। ওরা বলছে...।'

বিচিগুলো দেখামাত্রই চিনতে পারল চিকু। রুদ্রাক্ষ।

রোহন কথা বলে যাচ্ছিল....মনে হয় খুনীর সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় পুরুতমশাইয়ের গলার মালাটা ছিড়ে পড়ে গেছে।”

চমকে উঠল চিকু। কখনও না! কারণ, মন্দিরে ও প্রায়ই যায়। পরীক্ষার আগে তো বেশ ঘন-ঘন যায়। পুরুতমশাইকে ও কে খুটিয়ে লক্ষ্য করেছে। ওঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল না। বরং লকেটওয়ালা একটা সোনার চেন ছিল। মৃত্যুর পরেও সেটা ওঁর গলায় ছিল।

তা হলে?

বিধবা ভদ্রমহিলা খুন হওয়ার পর থেকেই সকলের ধারণা হয়েছিল যে, খুনী আসলে কোনও মানুষ। আবার তার বাইরের চেহারাটা অনেকটা পশুর মতো হওয়ায় কারও কারও ধারণা হয়েছিল সে মানুষ এবং পশুর মাঝামাঝি কোনও প্রাণী। তার সঙ্গে পূর্ণিমার সম্পর্কটা জুড়ে দিয়ে কে যেন প্রথম ওয়্যারউলফ বা নেকড়ে-মানুষের কথা বলেছিল।

পুরুতমশাইয়ের খুনের পর সেই ধারণাটা জোরালো চেহারা পেয়ে গেছে।

নেকড়ে-মানুষ। যে মানুষ প্রতি পূর্ণিমার রাতে ভয়ঙ্কর হিংস্র অমানুষে বদলে যায়, হয়ে যায় অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু। তারপর, পূর্ণিমা কেটে গেলেই, সে আবার সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে

ওঠে।

চিকু মনে-মনে এরকম একজন অসুস্থ মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

রুদ্রাক্ষের মালা...রুদ্রাক্ষের মালা...

রুদ্রাক্ষর মালা...।

একটা সন্দেহের ছায়া মনের কোণে উঁকি দিতে শুরু করল।

এরপর বোহন পঞ্চপ্রদীপের কথা বলল। বলল, প্রদীপের গায়ে লোম

পাওয়া গেছে। তাতে আধপোড়া লোমও আছে। হয়তো পঞ্চপ্রদীপের শিখায় খুনীর শরীর পুড়ে গেছে।

বেশ উত্তেজিতভাবে রোহন আর চিকু প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিল। শেষে রোহন বলল, ফাড়ির মাইতিবাবু বলছিলেন এবার কলকাতা থেকে গোয়েন্দার দল আসবে। সঙ্গে ফোরেনসিক এক্সপার্টরাও থাকবে। সে ওরা যা পারে করুক। তবে ওদের আগে মার্ডারারকে ধরতে পারলে আমার মনটা ঠাণ্ডা হতে।”

‘রোহনদা, তুমি আমাকে দু-চারদিন সময় দাও।' চিকু বলল।

'কেন রে?”

‘আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে...।

রোহন অবাক হয়ে চিকুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

স্যারের আত্মার কচকচি তখনও চলছিল। আর চিকু অবাক হয়ে স্যারকে দেখছিল।

স্যারের গলায় রুদ্রাক্ষের মালাটা নেই।

স্যারের বাঁ গালে, চোখের নিচে, নাকের পাশে, তুলো আর স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো।

হরিহরবাবু পড়াতে আসামাত্রই মুখের ব্যান্ডেজ সকলের চোখে । তিতুন, সুকান্ত, প্রদীপ্ত জিগ্যেস করেছে, ‘স্যার, মুখে কী হয়েছে?

উত্তরে স্যার হেসে বলেছেন, ' কিছু নয়—সামান্য একটু পুড়ে গেছে।

চিকু কোনও কথা বলতে পারে নি। ওর শরীরের ভেতরে বরফকুচির সোত বইতে শুরু করেছিল।

হরিহরবাবুই কি তা হলে পূর্ণিমার নরপিশাচ?

..গত পূর্ণিমার রাতগুলোয় যত মারা গেছে ভগবান তাদের ভবিতব্য আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। মারে কৃষ্ণ রাখে কে! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হাজির হয়ে অর্জুন যখন বিষাদে কাতর হয়ে বলেছিলেন, আত্মীয়স্বজনকে আমি হতা করতে পারব না, তখন শ্রীকৃষ্ণ হেসে

বলেছিলেন, হে পার্থ, তুমি ওদের হত্যা করবে কী, আমি তো ওদের আগেই মেরে রেখেছি। জাঙ্গিকুলের ঘটনাটা ঠিক একইরকম, বুঝলি? এখানে ওই খুনী স্রেফ নিমিত্ত মাত্র। ভগবান ওই চারজনকে আগেই মেরে রেখেছিলেন।

জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা শেষ করে হরিহরবাবু লেখাপড়ায় ফিরে এলেন। বই আর খাতা খুলে ওরা সবাই পড়ার মন দিল।

কিন্তু চিকুর বুকের ভেতরটা টিপ করছিল। কিছুতেই ওর পড়ায় মন বসছিল না।

পড়ানোর মাঝে কাকিমা একবার ঘরে এলেন।

হরিহরবাবুকে চা-বিস্কুট দিলেন। চিকুদের দিলেন একটা করে কেক।

কাকিমা বোধহয় বিকেলে স্নান করেছেন। ফরসা টলটলে মুখ, খুব বড় মাপের সিঁদুরের টিপ, গালে লাল আভা।

কাকিমাকে দেখলেই কেমন কাছের মানুষ বলে মনে হয়। আর হরিহরবাবু? কে কাকিমার স্বামী বলে ভাবতে চিকুর বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

পড়ানো শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবাই যখন বই-খাতা-ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ল, চিকু তখনও বসে রইল। ওর ভেতরে কেমন একটা রাগ আর জেদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। স্যারকে ও কয়েকটা কথা জিগ্যেস করতে চায়। বুঝতে চায় ওর সন্দেহটা সত্যি কি না।

কী রে, চিকু—তুই যে বসে রইলি-বাড়ি যাবি না?” স্নেহের সুরে হরিহরবাবু জিগেস করলেন।

আপনার সঙ্গে.... কয়েকটা কথা আছে, স্যার।' আমতা আমতা করে চিকু বলল।

বন্ধুরা সব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। শুধু প্রিয়াংকা জুতো পায়ে দিয়ে দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কাকিমা ভেতরের ঘরে হয়তো সংসারের কাজে ব্যস্ত।

কী কথা?" অন্দরে কোথাও টেলিফোন বেজে উঠল। কাকিমা ফোন ধরে কথা বলতে লাগলেন। বাইরের ঘর থেকে চিকু আবছাভাবে

কাকিমার গলা পাচ্ছিল।

আপনার গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা কোথায় গেল, স্যার?”

পলকে চারপাশটা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু সিলিং ফ্যানের ভনভন শব্দ কানে বাজছিল। হরিহরবাবুর বা চোখটা একবার কেঁপে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কোথাও বোধহয় খুলে পড়ে গেছে। আ-আমি ঠিক খে-খেয়াল করিনি....।

আপনার মুখ পুড়ে গেল কী করে?”

বললাম তো, সামান্য একটু পুড়ে গেছে!' হরিহরবাবু হঠাৎই রেগে উঠলেন।

‘না, স্যার ঠিক কীভাবে পুড়ল আমাকে বলতে হবে।' জেদি গলায় বলল চিকু।

এতবড় তোর স্পর্ধা! আমার কাছে জবাবদিহি চাস।' হরিহরবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। ওঁর গলার স্বর থরথর করে কাপছিল।

দরজার কাছ থেকে প্রিয়াংকা চিকুকে ডাকল, ‘চিকু কী হচ্ছে। চলে এসো।'

ওর দিকে না তাকিয়েই হাতের একটা ইশারা করল চিকু। বই-খাতা-ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফস করে বলে বসল, ‘আপনার বাঁ গালে পঞ্চপ্রদীপের ছাপ পড়ে গেছে।

চিকুকে অবাক করে দিয়ে হরিহরবাবুর বাঁ হাতটা সঙ্গে সঙ্গে গালে পৌঁছে গেল। ওঁর হাতের আঙুল আন্দাজে ভর করে পঞ্চপ্রদীপের ছাপটাকে খুঁজতে চাইল।

একইসঙ্গে চিকুর প্রমাণ খোজার পালা শেষ হলো। অসুস্থ মানুষটাকে ও খুঁজে পেয়ে গেছে। | কিন্তু ও এতটুকুও ভয় পেল না, কারণ, এতদিনে ও বুঝে গেছে, পূর্ণিমার রাত ছাড়া এই মানুষটাকে ভয় করার কোনও কারণ নেই।

ও টান-টান গলায় বলল, আপনার রুদ্রাক্ষের মালাটা গত পূর্ণিমার রাতে শিবতলার মন্দিরে ছিড়ে পড়ে গেছে, স্যার। আর সেরাতে পুরুতমশাই বোধহয় আপনার সঙ্গে একটু ধস্তাধক্তি করেছিলেন....।

‘চিকু! চিকু, তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। এসব আজেবাজে কথা বলার সাহস তুমি কোথা থেকে পেলে। অসভ্য, ইতর,..।'

স্যার রেগে গিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বটে, তবে সেগুলো কেমন যেন ফাকা আওয়াজের মতো শোনাচ্ছিল। আর স্যারের মুখ-চোখও কেমন অপরাধীর মতো ফ্যাকাসে লাগছিল।

ঠিক এই সময়ে অন্দরমহল থেকে কাকিমা বেরিয়ে এলেন।

কাকিমাকে দেখে চিকুর বুকের

ভেতরটা মুচড়ে উঠল। নিপাট ভালোমানুষ কাকিমা বোধহয় হরিহরবাবুর আসল চেহারাটা জানেন না। জানলে তিনি হয়তো শোকে-দুঃখে আত্মহত্যাই করবেন।

কাকিমার সামনে আর কোনও কথা বলতে পারল না চিকু।

হরিহরবাবু চিকুর দিকে পা এগিয়ে এলেন, মুখের ভাব মোলায়েম করে বললেন, 'তোর বয়েস অল্প। তোর না জানার জগইটা বড় বেশি। জানবি পাপ করলে তার শাস্তি পেতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেছিল....।

চিকু চোয়াল শক্ত করে বলল, “আমি কোনও পাপ করিনি...।'

কাকিমা স্বামীকে জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে? ভেতর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম...এত শোরগোল কীসের?

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে হরিহরবাবু হাসলেন। “ও কিছু নয়। চিকুকে একটু শাসন করছিলাম। তবে ছোট ছেলে..আমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

চিকু ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রিয়াংকা এতক্ষণ ওর হাত ধরে টানছিল। বাইরে এসেই প্রিয়াংকা

চিকুকে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার বলো তো! তোমাদের কথাবার্তার আমি কোনও মিনিং খুঁজে পাচ্ছি না। স্যারের সঙ্গে পঞ্চপ্রদীপ আর পুরুতমশাইয়ের রিলেশান কী?' . “চলো—যেতে-যেতে সব বলছি। তবে তুমি এখন কাউকে কোনও কথা বলতে পারবে না। প্রমিস?'

চিকুর হাত ছুঁয়ে প্রিয়াংকা বলল, ‘প্রমিস।

ওরা সাইকেল চালাতে শুরু করল। বাতাসে অনেকক্ষণ ধরেই একটা ঝড়ের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছিল। গুমোটের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস মাঝেমধ্যেই খেলে বেড়াচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, শিগগিরই একটা কালবৈশাখী হবে। তবে তার সঙ্গে একটু বৃষ্টি হলে ভালো হয়, চিকু ভাবল।

নয়

চিকুর কাছে সব শোনার পর প্রিয়াংকা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ও বলল, আমি আর বাংলা কোচিং-এ পড়তে যাব না। | চিকু বলল, "আমি যতটুকু বুঝেছি, পুর্ণিমার রাত ছাড়া স্যারকে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে আজ যেরকম কথাকাটাকাটি হয়ে গেল তাতে আমার আর বাংলা কোচিং-এ যাওয়া হবে না। বাড়িতে মা-বাবাকে কী বলব তাই ভাবছি...।'

তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই প্রুফ চাইবে। কলবে, এ হতে পারে না ইমপসিল।

প্রিয়াংকার কথাগুলো চিকু কিছুক্ষণ চিন্তা করল। ওর মনে হলো, প্রিয়াংকা ঠিকই বলেছে। হরিহরবাবুর মতো ধার্মিক সাত্ত্বিক মানুষকে কেউ রক্তপিশাচ বলে ভাবতে পারবে না। তা ছাড়া সবাই হয়তো জানতে চাইবে, হঠাৎ করে মানুষটা এরকম হয়ে গেল কেমন করে। উনি জাঙ্গিকুলে বহুবছর ধরে আছেন— এতদিন তো পূর্ণিমার রাতে কোনও খুন হয়নি! তা হলে চার মাস আগে হঠাৎ এমন কী হলো যে, মানুষটা অমানুষ হয়ে গেল।

চিকু এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রমাণের কথা ভাবতে-ভাবতে ওর মাথার ভেতরটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। সত্যিই তো, ওর মুখের কথা কেউ একবর্ণও বিশ্বাস করতে চাইবে না। তা ছাড়া চিকু নিজেও হরিহরবাবুকে নৃশংস ভয়ঙ্কর একটা অমানুষ বলে ভাবতে পারছিল না।

সুতরাং, অকাট্য একটা প্রমাণ চাই। আর তার জন্য বোধহয় আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কিন্তু পুণিমা আসতে তো এখনও অনেক দিন বাকি। এতগুলো দিন কি শ্রেফ হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায়?

ঠিক তখনই চিকুর মাথায় বুদ্ধিটা এলো।

ও প্রিয়াংকাকে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেই সবাই প্রমাণ চাইবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য আমার মুখের কথা সবাই মানবে কেন! ধরো, স্যার নিজে যদি সব স্বীকার করেন ?'

‘স্যার হঠাৎ কনফেস করতে যাবেন কেন?

কারণ আমি আর তুমি স্যারকে ফোন করে করে জ্বালাতন করে মারব।”

ওরে বাবা। প্রিয়াংকা ভয়ে আঁতকে উঠল।

চিকু ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ‘কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি রোজ একবার ফোন করবে আর আমি একবার। তাতেই আশা করি অ্যাকশন হবে।

আরও মিনিট পনেরো আলোচনার পর চিকু বাড়িতে ফিরে এল। রাতে শোওয়ার আগে ও মাকে বলল, বাংলা কোচিং-এ ঠিকমতো পড়া হচ্ছে না। ও অন্য বাংলা স্যারের কোচিং-এ ভর্তি হবে।

মা খানিকটা অবাক হলেও রাতে আর কথা বাড়াল না।

পরদিন সকালে বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর চিকু হরিহরবাবুর বাড়িতে ফোন করল।

কাকিমা ফোন ধরে হ্যালো বলতেই ও খুব মোলায়েম গলায় বলল, স্যার আছে?' ‘ধরো, দিচ্ছি।'

কাকিম চিকুর গলা চিনতে পারেননি। অবশ্য পারার কথাও নয়। এ কারণ, চিকু এর আগে স্যারের বাড়িতে মাত্র একদিন ফোন করেছে।

হ্যালো' হরিহরবাবুর গলা শুনতে পেল চিকু।

ও রিসিভারের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে লল, তোমার পাপের বোঝা তোমাকে শেষ করো

‘আমি সব জানি। ধীরে ধীরে ফিসফিস করে চিকু বলল, “গত চারটে

পূর্ণিমায় তুমি চারজন মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করেছ।

'কে, চিকু? চাপা গলায় জানতে; চাইলেন হরিহরবাবু।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চিকু বলে চলল, "আমি সব দেখেছি। সব সামনের পূর্ণিমায় কাউকে আমি খুন হতে দেব না।' | 'চিকু, তুই আমাকে মিছিমিছি সন্দেহ করছিস। আমি কোনও পাপ করি নি।

খুব ভালো ছেলে। মিছিমিছি আমায় ভুল বুঝিস না...।

'অন্য কাউকে খুন করার চেয়ে নিজেকে খুন করা অনেক সহজ। আমার সুইসাইড করা উচিত। তোমার মতে পাপীরা আত্মহত্যা করলে সেটা মহাপাপ হয় না। সামনের পূর্ণিমায় তুমি নিজে খুন করো--সেটা সবার পক্ষে ভালে হবে।'

ওপাশ থেকে আবেগে থরথর গলা শোনা গেল, "তুই ভুল করছিস। আমি পাপী নই। আমি কোনও পাপ করিনি।

'পূর্ণিমার রাতে তুমি কী করো জাঙ্গিকুলের সবাইকে আমি জানিয়ে দেব। রাস্তা-ঘাট লোকে তোমাকে দেখলে "ছি-ছি' করবে, তোমার গায়ে থুতু দেবে। সুইসাইড করা ছাড়া তোমার আর কোনও পথ নেই...।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল চিকু। ওর বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করে শব্দ হচ্ছিল। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছিল।

আবার কাল সকালে ও স্যারকে ফোন করবে।

কিন্তু এভাবে ফোন করলে কি কাজ হবে? সার কি পুলিশের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করবেন ? তা ছাড়া এ সব ভয়ঙ্কর অলৌকিক ঘটনা পুলিশ কি বিশ্বাস করবে?

এইসব নানা কথা ভাবতে-ভাবতে স্কুলের জন্য তৈরি হতে লাগল চিক। আজ জনতা কেবিনের সামনে প্রিয়াংকা সঙ্গে ও দেখা করবে। বলবে, টেলিফোনে স্যারের সঙ্গে ওর কী কথাবার্তা হয়েছে। তা হলে প্রিয়াংকা ফোন করার কাজে খানিকটা সুবিধে পারে। ' সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় দেশপ্রিয় সুইটস-এর কাছে রোহনকে দেখতে পেল

চিকু। সঙ্গে দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব দাড়িয়ে আছে। চিকু রোহনের গিয়ে সাইকেল থামাল। রোহনদা, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

উত্তরে রোহন পকেট থেকে রুদ্রাক্ষের শট দানা বের করল। এই বিষয়ে? মাথা নাড়ল চিকু : হ্যা।

‘এখন বলবি?”

না, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা বেলা তোমার সঙ্গে আলাদা কথা বলব। সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল চিকু।

সন্ধ্যেবেলা ওর কাছে সব কথা শুনে রোহন একেবারে তাজ্জব হয়ে গেল। ও আপনমনেই বলল, ‘একথা তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না!'

‘হ্যা—প্রিয়াংকাও তাই বলছিল। বলছিল, প্রমাণ চাই।'

দেশপ্রিয় সুইটস-এর কাছে একটা শিরীষ গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রোহন আর চিকু কথা বলছিল। বিকেলের দিকে একটা কালবৈশাখী হয়ে দু-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই রাস্তায় কাদা আর জল। স্কুটার বা গাড়ি গেলে কাদা-জল ছিটকে আসছে। তাই পথচারীরা রাস্তার পাশ ঘেঁষে হাঁটছে।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে চিন্তা করতে করতে রোহন বলল, “হুম —প্রমাণ চাই। কুদ্রাক্ষের মালা আর মুখের পোড়া

তো ঠিক প্রমাণ নয়...।'

“সেইজন্যেই তো আমি আর প্রিয়াংকা উড়ো ফোন করে স্যারকে কনফেস করতে বলছি। তাতে কী লাভ! ধর ফোনে হরিহর বাবু সব স্বীকার করলেন—তাতে তো ওকে অ্যারেস্ট করা যাচ্ছে না!

যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে এরকম আজগুবি ব্যাপার কে বিশ্বাস করবে!'

কেন? লাস্ট পূর্ণিমার রাতে সেই অমানুষটার হিংস্র গর্জন অনেকেই তো শুনেছে।

শোনা এক জিনিস, আর চোখে দেখা অন্য জিনিস,' রোহন আনমনাভাবে বলল।

রোহনের কথাটা চিকুর মনে বারবার প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। শোনা এক জিনিস, আর চোখে দেখা এক জিনিস... শোনা এক জিনিস, আর...।

কিছুক্ষণ পর চিকু বলল, ‘টেলিফোনে কাজটা ক'দিন চালিয়ে যাই...দেখি, মাথায় কোনও 'আইডিয়া আসে কি না। তুমিও ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দ্যাখো...তবে এখনই। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, কী বলো?"

‘মাথা খারাপ। তুই তোর অপারেশান চালিয়ে যা। কোনও আইডিয়া এলে আমাকে বলিস।'

রোহনের কথায় ঘাড় নেড়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলল চিকু।

প্রমাণ চাই। প্রমাণ।

রাতে বিছানায় শুয়ে চিকু ছটফট করতে লাগল। কিছুতেই ওর ঘুম আসছিল না। ওর ভয় হচ্ছিল যে, ঘুমিয়ে পড়লেই ও হয়তো হরিহরবাবুকে স্বপ্নে দেখবে। দেখবে সৌম্যকান্তি মানুষটা ধীরে-ধীরে কীভাবে বদলে যাচ্ছে অমানুষে। তারপর এগিয়ে আসছে চিকুর দিকে। সামনে দুটো হাত বাড়ানো। সেই হাতের দশ আঙুলে লম্বা লম্বা বাঁকানো নখ।

চিকু টের পাচ্ছিল, প্রিয়াংকা ওকে হাত ধরে প্রাণপণে টানছে আর চিৎকার করছে, 'পালাও, চিকু, পালাও।'

চিকুর ঘুম ভেঙে গেল। নানান কথা ভাবতে-ভাবতে কখন ওর তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল কে জানে!

প্রিয়াংকার কথা মনে পড়ল ওর। রাত আটটা নাগাদ প্রিয়াংকাকে ও ফোন করেছিল। তখনই প্রিয়াংকা ওর উড়ো ফোনের কথাবার্তা চিকুকে জানিয়েছে। কথাগুলো চিকুর মনে ভেসে উঠল আবার।

ও-প্রান্তে ফোন বেজে উঠতেই হরিহরবাবুর স্ত্রী ফোন ধরেছেন।

'হ্যালো'

"স্যার আছেন?' প্রিয়াংকা স্বাভাবিক গলায় জিগ্যেস করেছে।

ধরো—দেখছি..।"

একটু পরেই ফোন ধরে স্যার 'হ্যালো' বলতেই প্রিয়াংকা চিকুর পরামর্শ মতো বলে উঠেছে, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

'কে? কে কথা বলছ? হতচকিত হয়ে হরিহরবাবু জিগ্যেস করলেন।

ফিসফিস করে প্রিয়াংকা বলল, 'সামনের পূর্ণিমায় তুমি বাড়ি ছেড়ে বেরোবে না। বেরোলেই তোমাকে খতম করে দেওয়া হবে।"

‘আমি,আমি.. আমার কোনও দোষ নেই। এটা... এটা...আমার অসুখ। অসুখের ওপর আমার কোনও হাত নেই...।'

‘তুমি শিক্ষকদের কলঙ্ক। জাঙ্গিকুলের কলঙ্ক।

না, না, আমি কোনও অন্যায় করিনি..কোনও পাপ করিনি। আমার আত্মা পবিত্র।

‘তোমার আত্মা বলে কিছু নেই। তুমি প্রেতাত্মা।'

হরিহরবাবু ফুপিয়ে কেঁদে উঠে। বললেন, “বিশ্বাস করো, আমার কোনও দোষ নেই। একটা শয়তান ছল করে। আমাকে দিয়ে ফুসলিয়ে করিয়ে নেয়। আমার তখন জ্ঞান থাকে না।

আর কাউকে খুন করার চেয়ে নিজেকে খুন করা অনেক সহজ। তোমার সুইসাইজ করা উচিত...তোমার সুইসাইড করা উচিত...।

'তুমি কে? আচমকা প্রশ্ন করলেন হরিহরবাবু। তাঁর গলার স্বর দিব্যি স্পষ্ট। কান্নার কোনও ছোঁওয়া সেখানে নেই।

তা হলে কি স্যার এতক্ষণ অভিনয় করছিলেন প্রিয়াংকা মনেমনে ভাবল।।

‘তুমি কে? চিকুর বন্ধু। কিছুক্ষণ ওপ্রান্ত চুপচাপ। তারপর তুমি কি প্রিয়াংকা?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়াংকা ভয় পেয়ে। রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। ওর হাত থরথর করে কাঁপছিল।

সত্যিই কি এটা স্যারের অসুখ? চিকু নিজেকে যেন প্রশ্ন করল। এই অসুখের ওপরে কি স্যারের কোনও হাত নেই। সত্যিই কি একটা শয়তান ভর করে স্যারকে দিয়ে প্রতি পূর্ণিমায় জঘন্য কাজ করিয়ে নেয়?

এইসব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই চিন্তাগুলো আবার চিকুর ওপরে ঝাপিয়ে পড়ল।

একইসঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল, স্যারকে আবার ফোন করতে হবে।

দশ

হরিহরবাবুর কাছ থেকে নেমন্তন্নটা এল একেবারে আচমকা।

এরকম ভয়ঙ্কর নেমন্তন্ন চিকু জীবনে কখনও পায়নি।

পূর্ণিমার রাতে স্যার ওকে বাড়িতে আসতে বললেন। সঙ্গে প্রিয়াংকাকেও নিয়ে আসতে বললেন।

উড়ে টেলিফোনের ব্যাপারটা তিন-চারদিন চলার পরই নেমন্তন্নটা পেল চিকু।

রোজকার মতো সেদিন সকালে স্যারের বাড়িতে ফোন করেছিল চিকু।

রিং বেজে ওঠামাত্র স্যার নিজেই ফোন

ধরলেন।

'হ্যালো, চিকু?"

চিকুর মনে হলো, স্যার বোধহয় ওর টেলিফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

চিক ফিসফিসে গলায় বলল, সামনের পূর্ণিমায় কোনও মানুষ যেন খুন না হয়।'

না, না, আর কেউ খুন হবে না, আর কেউ খুন হবে না।

স্যারকে বাধা দিয়ে চিকু বলল, "কিন্তু একটা সুইসাইড যেন হয়।" 'সুইসাইড।

হা। একটা নরপিশাচ যেন আত্মহত্যা করে। এ-আত্মহত্যায় কোনও পাপ নেই।

টেলিফোনের ও-প্রান্তে হরিহরবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপর কান্না'ভাঙা গলায় বললেন, "নিজেকে খুন করতে আমি পারব না। তা

হলে তোদের কাকিমাকে কে দেখবে! ওকেও হয়তো আমার সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে। আর সেটা তো সম্ভব নয়। এটা যে কী কষ্ট তা তুই বুঝবি না। এ

অসুখের জ্বালা আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছে...।

চিকু স্যারের কান্নায় নরম হলো না। কোথা থেকে যেন এক দুর্জয় সাহস ওর ভেতরে তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ও বলল, যাদের তুমি খুন করে তাদের আত্মীয়স্বজন তোমার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছে। তোমাকে আত্মহত্যা করতেই হবে।' 'চিকু, চিকু—শোন—শোন।

কী?' 'সামনের পূর্ণিমায় তুই আমার বাড়িতে আয়। তোকে সব খুলে বলব। তখন তুই আমার অসুখের ব্যাপারটা বুঝতে পারবি...।

আগামী পূর্ণিমায় স্যার ওঁর বাড়িতে যেতে বলছেন। চিকু বেশ অবাক হলো। তা হলে কি সামনের পূর্ণিমায় কেউ খুন হওয়ার ভয় নেই।

...সন্ধ্যের পর তুই আসিস..' স্যার তখনও কথা বলে যাচ্ছিলেন, '...আর প্রিয়াংকাকেও বলে আসি

কেন, প্রিয়াংকা কেন।

প্রিয়াংকার নাম শুনে চিকু ইলেকট্রিক শক খেল। স্যার কি ওদের দুজনের গলাই ধরে ফেলে।

সুতরাং আর লুকোচুরি করে কোন লাভ নেই। | তাই চিকু এবার স্বাভাবিক গলায় কথা বলল, "প্রিয়াংকাকে সঙ্গে নিয়ে আসব কেন?"

উত্তরে স্যার হাসলেন। তুই সে সন্ধ্যেবেলায় আমার সঙ্গে যখন তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছিলি, প্রিয়াংকা তখন তোর সঙ্গে ছিল। ওর মনে হয়তো নানারকম কৌতূহল হচ্ছে। হয়তো তোরই মত ও আমাকে শয়তান, পিশাচ, কিংবা অমানুষ বলে ভাবছে। আর তুই তো জানিস, তোরা দুজন আমার সবচেয়ে প্রিয় স্টুডেন্ট। তোদের মনে কোনও ব্যথা দিতে আমি চাই না।

চিকু কেমন যেন দোটানায় পড়ে গেল। ওর চিন্তাগুলো মনের ভেতরে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

হরিহরবাবু একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন। ওঁর কথায় সাপ-খেলানে বাঁশির মতো সুর। চেতনাকে অবশ করে দিতে চাইছে। চিকুর মাথা ঝিমঝিম করছিল।

..চোখের সামনে যদি সব দেখি তবে তোরা ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে পারবি। বুঝতে পারবি আমার আসনে কোনও দোষ নেই। সবই নিয়তি।

| শেষ পর্যন্ত চিকু রাজী হলো। কাল জলজ্যান্ত প্রমাণ চাইলে এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। তবে রোহনদাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। যদি সত্যি সত্যি কোনও বিপদ হয় তা হলে রোহন বাঁচাবে।

সূতরাং রোহনকে নেমন্তয়ের জানাল চিকু।

কী করি বলো তো, রোহনদা যাব?

"নিশ্চয়ই যাবি। তা না হলে প্রমাণ হবে কী করে?'

'যদি স্যারের বাড়িতে সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়?

খদ্দেরের পাঞ্জাবির তলায় হাত ঢোকাল রোহন। তারপর একটা দোনালাশর্টগান বের করে চিকুকে দেখাল।

চিকু দ্যাখ, নলকাটা দোনলা মেশিন। দেশি, তবে কাজে বিদেশিকে টেক্কা দেবে। কিছুদিন ধরে শুনছিস না, পাশের নলডাঙ্গায় খুব ডাকাতি হচ্ছে। তাই গত মাসে এটা কিনেছি। এটা কাছ থেকে গুলি করলে বডি ফুটো করে একজোড়া গুলি বেরিয়ে যাবে। চিকুর কাধে হাত রাখল রোহন। মন-কেমন কান্না গলায় বলল, "তুই, প্রিয়াংকা, তোরা পড়াশোনায় এ ক্লাস। আমাদের দেশের ফিউচার। আর আমার কাজ কী জানিস? যে শয়তানের বাচ্চারা তোদের মতো হট ছেলেমেয়েদের পথের কাঁটা হয়ে নড়াবে তাদের খতম করা। হয় জান, নয় মান, খতম করে দেব!' শটগানটা উড়িয়ে ধরল রোহন, আকাশের চাঁদের দিকে তাকালঃ 'তোর কোনও ভয় নেই। চাঁদটা পুরোপুরি গোল হতে দে, তারপর দেখবি...জাঙ্গিকুলের সব গোলমাল থামিয়ে দেব।

চিকু অবাক হয়ে রোহনকে দেখছিল। বিশুদার দোকানের বালবের

আলোয় রোহনের চোখ চকচক করছিল। মন্দকে খতম করার জন্যই ও মন্দ হয়েছে।

পূর্ণিমার দিন কীভাবে ওরা যাবে, কখন যাবে, সেসব চাপা গলায় আলোচনা করে নিল রোহন আর চিকু। চকু বলল, প্রিয়াংকার সঙ্গে ও এ ব্যাপারে কথা বলে নেবে। তারপর ওরা পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

পুর্ণিমার তখনও ষোলো দিন বাকি ছিল। চিকুরা ষোলো, পনেরো, চৌদ্দো পরে দিন গুনতে লাগল।

এগারো

পূর্ণিমা এসে পড়ার দু-চারদিন সেই বর্ষা জাঙ্গিকুলে উকিঝুঁকি মারতে শুরু করল। জলাপুকুরের জল বেড়েছে।

আগাছার ঝোপঝাড়গুলো প্রকৃতির ছোয়া পেয়ে আবার মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। পথঘাটে খানাখন্দে ঘোলা জল জমতে লাগল।

বর্ষার সময় সবুজ গাছপালা থেকে এক অদ্ভুত গন্ধ পায় চিকু। সেই গন্ধে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল। বাঁশপাতি, কাঠঠোকরা, বুলবুলি, মাছরাঙা পাখিগুলো ঝকঝকে রং নিয়ে এখানে-সেখানে উড়ে বেড়াতে লাগল।

পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ চিকু আর প্রিয়াংকা যখন সাইকেল চালিয়ে হরিহরবাবুর বাড়িতে এসে পৌছল তখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। আশপাশ থেকে ব্যাঙের গ্যাঙোর-গ্যাঙ ডাক কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে।

গ্রিলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল চিকু আর প্রিয়াংকা। সাইকেল দুটো একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর পিছন ফিরে রাস্তার দিকে তাকাল।

একে বৃষ্টি, তার ওপরে রাস্তার আলো টিমটিম করে জ্বলছে। তা সত্ত্বেও ওরা রোহন আর ছোটকুকে দেখতে পেল। একটা জামগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে হাত নাড়ল। তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হরিহরবাবুর বাড়ির কাছে চলে এল। ভেতরে ঢুকে পড়ল।

রোহন একটা বর্ষাতি পরে এসেছে। আর ছোটকুর মাথায় নীল রঙের পলিথিন শিটের ঘোমটা। তার ওপরে বৃষ্টি পড়ে চড়বড়-চড়বড়' শব্দ হচ্ছে।

রোহনের ইশারায় ছোটকু সুপুরিগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল।

রোহন চিকু আর প্রিয়াংকার খুবকাছে এসে চাপা গলায় বলল,

“তোরা ভেতরে যা। আমি আর ছোটকু দরজার কাছেই আছি। কান পেতে সব শোনার চেষ্টা করছি। কেস ডেঞ্জারাস হয়ে উঠলেই আমাকে ডাকবি।

কথাগুলো বলে রোহন আর ছোটকু আড়ালে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিকু কলিংবেল বাজাল।

কাকিমা এসে দরজা খুলে দিলেন।

স্নেহের গলায় বললেন, 'ইস! অনেকটা ভিজে গেছ দেখছি! ভেতরে চলো, তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে নেবে।

কাকিমার পিছন পিছন ওরা দুজনে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে পাথর হয়ে গেল।

হরিহরবাবু মেঝেতে বেশ আয়েস করে বসে আছেন। খুব ধীরে ধীরে পান চিবোচ্ছেন। চোখে শান্ত নিশ্চিন্ত দৃষ্টি। যেন শিকার খুব কাছাকাছি, একেবারে আওতার মধ্যে চলে এসেছে।

স্যারকে দেখামাত্রই চিকু আর প্রিয়াংকার সব সাহস উবে গেল। সাঙ্ঘাতিকভাবে মনে পড়ে গেল, আজ পূর্ণিমা—যদিও আকাশে মেঘ থাকায়। চাদ চোখে পড়েনি। তাতে হরিহরবাবুর কি কোনও অসুবিধে হবে? বোধহয় না। আকাশে গোল চাঁদ কোথাও একটা থাকলেই হলো। তা হলেই অমানুষিক অসুখটা মাথাচাড়া দিতে পারবে।

ওরা দুজনে কুলকুল করে ঘামছিল। আর ফেলফেলে চোখে হরিহরবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিল।

‘আয়, আয়-বোস।' একগাল হেসে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন হরিহরবাবু, বসে একটু জিরিয়ে নে। তারপর সব বলছি। তোরা যা-যা জানতে চাস জিগ্যেস করবি—আমি তোদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেব।

সতরঞ্জি পাতাই ছিল। ওরা স্যারের কাছ থেকে একটু দূরত্ব রেখে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

কাকিমা একটা তোয়ালে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেনঃ “এই নাও, এটা

দিয়ে গা-মাথা একটু মুছে নাও' তোয়ালেটা প্রিয়াংকার হাতে দিলেন কাকিমা, আড়চোখে একবার স্বামীর দিকে দেখলেন : 'আজ আর কেউ পড়তে আসবে না?”

না। 'আজ ওদের দুজনকে স্পেশাল ক্লাস করাব বলে ডেকেছি।'

কাকিমা বললেন, 'তোমরা পড়ো। আমি পেঁয়াজি আর বেগুনি ভাজছি খেয়ে যাবে।'

কাকিমা আড়ালে চলে যেতেই হরিহরবাবু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, তোদের আজ খোলাখুলি সব বলব। আমার একটা মারাত্মক অসুখ হয়েছে। এমন অসুখ যে, সবাইকে এটার কথা খোলাখুলি বলা যায় না। তা সত্ত্বেও আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। তাদেরকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অসুখটার আভাস দিয়েছি। তারা ওষুধ দিয়েছে... কিন্তু সেসব ওষুধে কোনও কাজ হয়নি..।'

চিকু আর প্রিয়াংকা দম বন্ধ করে শুনছিল। ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

বাইরে থেকে বৃষ্টির শব্দ ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্গের ডাকও। সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় চিকুর কেমন শীত শীত করছিল।

আনমনা চোখে একটা বন্ধ জানলার দিকে তাকিয়ে হরিহরবাবু বলে চললেন, অসুখটা আমার আগে ছিল না। গতবছর পুজোর সময় আমি আর তোদের কাকিমা—আমরা দুজনে মিলে হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কুলুমানালি ওইসব আর কী! সেখানে একদিন এক পাহাড়ি পথে একজন ট্রাইবালের সঙ্গে—মানে, উপজাতির লোকের সঙ্গে—আমাদের আলাপ হয়। লোকটা পথের ধারে একটা ছোট্ট ঝুপড়িতে বসে উলকি কাটার কাজ করছিল। আমি আর তোদের কাকিমা সেখানে দাঁড়িয়ে লোকটির কাজ দেখছিলাম। লোকটা ভাঙা-ভাগ হিন্দিতে আমাকে বলল, “বাবুজি, আপনারা উলকি কেটে গায়ে ছবি এঁকে নিন। আমার কাছে নানান ধরনের ছবি আছে। এমন ছবিও আছে, যার মধ্যে অনেক ক্ষমতা আছে—মানুষকে তেজি করে দেয়। সব মুশকিল আসান করে দেয়। এইসব উলকি মন্ত্র-তন্ত্র করে আঁকতে হয়। মাত্র একশো টাকা দিলেই

এঁকে দেব।"

কী যে হলো আমাদের! লোকটার কথায় রাজী হয়ে গেলাম। কথা বলতে বলতে পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে ফেললেন হরিহরবাবু। ওটার গলার কাছটা ধরে বাঁদিকে টেনে নামালেন।

“এই দ্যাখ।"

ঘরের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, স্যারের বা বাহুতে একটা লোমশ পশুর ছবি আঁকা। পশুটা কেমন যেন কুজো হয়ে রয়েছে-যেন এক্ষুনি শিকার লক্ষ্য করে লাফ দেবে।

পাঞ্জাবিটা আবার ঠিকঠাক করে নিলেন স্যার।

...তারপর থেকেই আমার ক্লান্তি ক্রমশ কমতে লাগল। সবসময় শরীরের ভেতরে একটা চনমনে ভাব টের পেতে লাগলাম। বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে কিছু একটা করার নেশায় একেবারে খেপে উঠতে লাগলাম। সেইসঙ্গে কেমন জ্বর-জ্বর লাগত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করলেন হরিহরবাবু বেশ মনে আছে, গত ডিসেম্বরের পূর্ণিমায় আমি প্রথম খুন করেছি। না, না, মানুষ নয়—একটা ছাগলকে মেরেছিলাম। তারপর...ধীরেধীরে অসুখের তেজটা বাড়তে লাগল। আর...আর...গত ফেব্রুয়ারিতে প্রথম একজন ভবঘুরে ভিখিরিকে খুন করলাম।

“তোরা হয়তো বলবি আমি মহাপাতক, পাপী। কিন্তু আমি বলব, আমি নির্দোষ। 'আমার একটা অসুখ হয়েছে—যে অসুখটা ডাক্তাররা সারাতে পারছে না। তোরা আমাকে ভুল বুঝিস না।

মাঝে-মাঝে মনে হয় আমি অপরাধী, আত্মহত্যা করে এই নোংরা জীবনটাকে শেষ করে দিই। কিন্তু তারপরই আবার মনে হয় আমার তো কোনও দোষ নেই।' মুখ তুললেন হরিহরবাবু। ওঁর চোখে জল। কান্না-ধরা গলায় তিনি বললেন, “আসলে এই অসুখটা আমার নিয়তি...।'

কথা বলতে বলতে হরিহরবাবুর গলাটা কর্কশ হয়ে যাচ্ছিল।

...আমার 'ভবিতব্য...'আমার নিয়তি... তাদেরও বোধহয় নিয়তি....।

তারপরই সব অর্থহীন কর্কশ জড়ানো শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল ওঁর মুখ দিয়ে। এবং ভয়ঙ্কর পরিবর্তনটা শুরু হয়ে গেল। চিকু আর প্রিয়াংকা এত ভয় পেয়ে গেল যে, ভয় বোধটাই ওদের মন থেকে উবে গেল। ওরা হাঁ করে স্যারের পালটে যাওয়া দেখতে লাগল। যেন মূর্ছা হয়ে কোনও হরর সিনেমা দেখছে। সারের দেহটা ফুলতে লাগল। চোয়াল লম্বা হয়ে গেল। ঠোট হয়ে পান-চিবোনো ছিবড়ে বেরিয়ে এলো। দাঁতগুলো হয়ে গেল ধারালো আর লম্বা।

ফুলে ওঠা শরীরের চাপে পাঞ্জাবি ফেটে গিয়ে কাপড়ের টুকরোগুলো এখান-ওখান থেকে ঝুলে রয়েছে। সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় পতাকার মতো উড়ছে।

বর্ষায় আগাছা গজিয়ে ওঠার মত স্যারের সারা শরীরে বড় বড় লোম গজিয়ে উঠল। হাত-পায়ের নখগুলে মাপে লম্বা হয়ে বাঁকানো ছুরির ফল হয়ে গেল।

চোখের সামনে হরিহরবাবু মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে গেলেন।

প্রিয়াংকা ভয়ে থরথর করে কাপতে কাপতে উঠে দাঁড়াল। চিকুর হাত ধরে প্রচণ্ড এক টান মারল।

চিকু অনেকক্ষণ ধরে একটা চিৎকার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। স্বপ্নের মধ্যে যেন দৌড়তে চাইলেও দৌড়নো যায় না। মুহুর্তে চিৎকারটাও চিকুকে নিয়ে সেইরকম খেলা খেলছিল।

ভয়ঙ্কর অমানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে মাথা ঝাকাল। লালা ছিটকে পড়ল ওটার মুখ থেকে। তারপর চলল গর্জন করে চিকুদের দিকে এক-পা এগিয়ে এল। কোমরের কাছে ধুতিটী এলোমেলোভাবে জড়িয়ে থাকায় প্রাণীটাকে ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই চিকুকে অবাক করে দিয়ে প্রিয়াংকা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে।

যে-প্রমাণ ওরা এতদিন ধরে মুভি সেই প্রমাণ এখন ওদের চোখের কী ভয়ঙ্কর প্রমাণ!

"...চোখের সামনে যদি সব দেখছ তবে তোরা ব্যাপারটা তলিয়ে বুজতে পারবি। বুঝতে পারবি আমার কোনও দোষ নেই। সবই নিয়াই টেলিফোনে শোনা স্যারের কথাগুলো মনে পড়ে গেল চিকুর। এই অমানুষটাকেই ও জলাপুকুর থেকে শ্যাওলা আর কচুরিপানা মাথায় নিয়ে উঠে আসতে দেখেছিল। অমানুষটা এক হিংস্র গর্জন করে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কড়কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ার শব্দ হলো। তারপরই চিকুরা শুনতে পেল দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার আওয়াজ। কাকিমা ভেতর থেকে পড়িমরি করে ছুটে এলেন পড়ার ঘরে। অমানুষটার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজার ছিটকিনি ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল রোহন আর

ছটকু। ওদের সারা শরীর জলে ভেজ। বড় বড় স্বাস ফেলে হাঁফাচ্ছে। ওদের গায়ে বর্ষাতি বা পলিথিন শিট নেই। বোধহয় বাইরে কোথাও খুলে এসেছে। ওদের দেখেই কাকিমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কোনওরকমে তিনি বললেন, “কে - কে তোমরা? উত্তরে রোহন শটগানটা বের করে উচিয়ে ধরলেন।

চিকু আর প্রিয়াংকা তখন ঘরের এক কোণে দেওয়ালে মিশে যেতে চাইছে। এ ওকে আকড়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে।

বিশাল চেহারার অমানুষটার ছায়া ঘরটাকে অন্ধকার করে দিয়েছে। ওটার ললাটে সবুজ চোখ রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির মতো ধকধক করে জ্বলছে। ওটা কি বুঝল কে জানে। চিকুর দিক থেকে ঘুরে তাকাল রোহনদের দিকে।

ছোটকুর চোখ যেন ছিটকে বাইরে হয়ে আসবে। ওর মুখ হাঁ করা। সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। কিন্তু রোহনের চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। ও যেন আগ থেকেই জানত এইরকম কিছু একটা হবে। রোহন আর দেরি করল না। স্যারের মুখের দিকে শটগান তাক করে চাপা গলায় বলল, তোমার আত্মাকে মুক্তি দিলাম।

তারপর ফায়ার করল।

শব্দটা বদ্ধ ঘরে তেমন জোরালো শোনাল না। তবে দুটো গুলিই প্রাণীটার মুখে গিয়ে লাগল । একটা বাঁ চোখে, একটা কপালে।

এক বুক কাঁপানো গর্জন করে বিশাল অমানুষটা ভূমিকম্পে ধসে পড়া বহুতল বাড়ির মতো মেঝেতে পড়ে গেল। ওটার হাত কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। কাকিমার শাড়ির ভাজে ওটার বাঁকানো নখ আটকে গেল। ফলে সেই টানে কাকিমাও পড়ে গেলেন মেঝেতে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলে।

শটগানে নতুন গুলি ভরে নিল রোহন। তারপর সতর্ক পায়ে প্রাণীটার কাছে এগিয়ে এল।

চিকু আর প্রিয়াংকাও নিজেদের সামলে নিয়ে প্রাণীটার দিকে কৌতূহলের নজরে দেখতে লাগল।

আর কাকিমা লোমশ শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে বিলাপ শুরু করলেন।

সেই বুকফাটা কান্না পাথরকেও গলিয়ে দিতে পারে।

প্রাণিটার মুখের খানিকটা অংশ শটগানের গুলির দাপটে ভেঙ্গেুর তছনছ হয়ে গেছে। মুখ আর কপাল রক্তে মাখামাখি। সারা শরীর নিথর।

বোঝাই যাচ্ছিল, পূর্ণিার রাতে জাঙ্গিকুলে আর কখনও কেউ খুন হবে।

হঠাৎই একটা অবাক কাণ্ড ওদের চোখে পড়ল।

প্রাণীটার দেহের লোমগুলো শরীরের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে। বাঁকানো লম্বা নয় আবার ঢুকে যাচ্ছে আঙুলের ভিতরে। দাঁতগলো ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়ায় ঠোঁট জোড়া টান-টান অবস্থা থেকে ক্রমশ ঢিলে হচ্ছে, আবার ঢেকে দিচ্ছে দাঁত পাটিকে।

ধীরে ধীরে মৃতদেহটা বদলে গেল। অমানুষ থেকে আবার মানুষ হয়ে গেল।

ওদের চোখের সামনে এখন পড়ে রয়েছে হরিহরবাবুর মৃতদেহ। সেই মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে তার স্ত্রী হাউহাউ করে কাঁদছেন।

চিকু আর প্রিয়াংকা কাছে এগিয়ে গেল। অস্বস্তি হলেও কাকিমাকে ওরা সান্ত্বনা দিতে চাইল।

কাকিমা, কাদবেন না। স্যারের শরীরে পিশাচ ভর করেছিল। স্যারের আত্মা এবার শান্তি পাবে। চিকু নরম গলায় বলল।

উত্তরে কাকিমা স্বামীর মৃতদেহ থেকে মুখ তুললেন। ঘুরে তাকালেন চিকু আর প্রিয়াংকার দিকে।

‘কিন্তু আমাকে শাস্তি দেবে কে?

আমিও তো হাতে উলকি কেটে ছবি এঁকেছি।' | চিকু অবাক হয়ে দেখল কাকিমার চোখের মণিতে দু টুকরো লাল আগুন জলছে। আর ঠোটের বাইরে বেরিয়ে এসেছে দুটো লম্বা দাঁত।

খলখল করে হেসে কাকিম উঠে দাঁড়ালেন।

প্রিয়াংকা চিৎকার করে উঠল। আমরা দুজনে বেশ ছিলাম। পিশাচ বর, আর পিশাচ বউ। ও শিকার করে রক্ত খেয়ে আসত। আর আমি ওর শরীর থেকে রক্ত খেতাম। এমনই ছিল আমাদের রক্তের সম্পর্ক। এখন কী হবে! একা একা আমি বাঁচব কী করে।

রোহন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। চিকু, প্রিয়াংকা, ছোটকুরও একই দশা। এরকম একটা আশ্চর্য ঘটনার জন্য ওরা কেউই তৈরি ছিল না।

কাকিমা আচমকা বেড়ালের মতো লাফ দিলেন।

ওর লক্ষ্য ছিল রোহন। কিন্তু ছোটকু পলকে ছুটে এসে রোহনকে আগলে দাঁড়াল।

ফলে রাগে শোকে অন্ধ পিশাচী খ্যাক করে কামড়ে ধরল ছোটকুর গলা। ওর ধারালো দাঁতে ছোটকুর গলার নলি ছিড়ে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। চাপা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল।

সম্মোহনের ঘোর কাটিয়ে রোহন শটগান তুলে ধরল। ছোটকুর ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা কাকিমার ঘাড়ে শটগানের নল ঠেকিয়ে ফায়ার করল।

ছোটকু আর কাকিমা দুজনেই জড়াজড়ি করে খসে পড়ল মেঝেতে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ছোটকুর রক্তমাখা দেহ ছেড়ে আহত কেউটের মতো রোহনকে ছোবল মারতে চাইলেন কাকিমা।

শরীরটাকে দু-পাক গড়িয়ে ধারালো দাঁতে রোহনের পা কামড়ে ধরলেন। রোহন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকারে সকলের কানে তালা লেগে গেল।

বাইরে বিকট শব্দে বাজ পড়ল।

আর রোহন অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে-করতে শটগানের বাট হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিল কাকিমার মাথায়।

ও পাগলের মতো চিৎকার করছিল আর রাগে অন্ধ হয়ে শটগানের ব্যাট দিয়ে পিশাচীর মাথাটা থেতো করছিল।

একসময় কাকিমার দেহটা অসাড় হয়ে গেল। থেতলানো মাথাটা চুলে

রক্তে মাখামাখি। আর হরিহরবাবুর মতোই কাকিমার দন্ত মাপে ছোট হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। চোখের মণির লাল বিন্দু দুটোও মিলিয়ে গেল।

রক্তে ভেসে যাওয়া ঘরে সিটে মৃতদেহ পড়ে রইল।

রোহন ছোটকুর ওপরে ঝাপিয়ে পড়ে কাদছিল। ওর পা থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল।

প্রিয়াংকা রোহনের পিঠে হাত রেখে ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল। তারপর খেয়াল হতেই একটা রুমাল নিয়ে রোহনের পায়ের কাটা জায়গাটা বাঁধতে লাগল।

চিকু কোনওরকমে টলতে-টলতে ভেতরের ঘরের দিকে এগোল। ফোন করে সবাইকে খবর দিতে হবে। ফাড়িতেও একটা খবর দেওয়া দরকার।

বাইরে বৃষ্টির তেজ হঠাৎই আরও বেড়ে গেল।

কান-ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল আবার।

ছবি : সমীর সরকার